সঞ্জিব নেওয়ার

VAISHYA
SHUDRA
BRAHMIN
KSHATRIYA
HINDU

হিন্দুধর্মের দলিতরা

হারানো সন্তানদের জন্য ধর্মের যুদ্ধ

অনুবাদে
অরূপ কুমার দাশ ও দিবাকর ভট্টাচার্য্য

হিন্দুধর্মের দলিতরা

হারানো সন্তানদের জন্য ধর্মের যুদ্ধ

হিন্দুধর্মের দলিতরা

হারানো সন্তানদের জন্য ধর্মের যুদ্ধ

সঞ্জিব নেওয়ার

মুখবন্ধ

শ্রমের বিভাজন হৃদয়ের বিভাজন নয়, এটাই হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি বেদের কথা। মানব শরীরের চারটি দিক আছে, যেমনঃ বুদ্ধিমত্তা (ব্রাহ্মণ), শক্তিমত্তা (ক্ষত্রিয়), ব্যবস্থাপনা (বৈশ্য) ও ভারবহন (শূদ্র) এগুলো শরীরকে সম্পূর্ণ করে। মুখ বা মাথা বুদ্ধিমত্তাকে উপস্থাপন করে, হাত শক্তিকে, উদর ব্যবস্থাপনাকে উপস্থাপন করে, এবং পা ভারবহনকে উপস্থাপন করে।

একজন মানুষ মানুষ হয় যখন সকল দিকগুলো একত্রে কাজ করে। মাথা, হাত, উদর বা পা একা একা একটি পূর্ণ শরীর গঠন করতে পারে না।

ব্রাহ্মণ একটি জাত না। ব্রাহ্মণ হচ্ছে একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যেটি সকল মানুষ বিভিন্ন মাত্রায় অধিকার করে থাকে। একইভাবে, শূদ্রও একটি জাত না। শূদ্রও কটি বৈশিষ্ট্য যেটা প্রতিটা মানুষের মধ্যে ফুটে উঠে। আমরা সকলে ব্রাহ্মণ। আমরা সকলে শূদ্র। আমরা সকলে মানুষ। 'হিন্দুধর্ম হলো জাতপাতের ঘৃনার ভিত্তিতে একটা অসৎ ধারনা' এটা প্রমাণ করার জন্য ধর্মান্ধদের দ্বারা এত প্রোপাগাণ্ডা সত্ত্বেও, একারনেই আপনি দেখতে পাবেন দাসী/শূদ্রের পুত্র বিদুর মহাভারতের শক্তিশালী রাজ্য হস্তিনাপুরের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। একারনেই, আপনি দেখবেন বাল্মীকি তথাকথিত নিম্নবর্ণের হয়েও মহর্ষি হয়েছেন, যিনি একজন মহান ঋষি হিসেবে পুরো হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক পুজ্য। মাতা সীতা তাঁকে পিতা হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো তাঁর আশ্রমে কাটিয়েছেন। মহর্ষি জাবাল, একজন বেশ্যার পুত্র ছিলেন, তিনি অথর্ববেদের ঋষি হয়েছিলেন। এই তালিকার শেষ নেই।

এই গ্রন্থটি ভুল ধারনা দূর করবে এবং সমাজে সাম্যতা নীতি প্রতিষ্ঠা করবে যেটা হিন্দুধর্মের মূল কাঠামো গঠন করে।

"হিন্দুধর্মে দলিত" এইটি "ডিসকভার হিন্দুইজম" সিরিজের দ্বিতীয় বই, এর লক্ষ্য হলো সকল রূপকথাকে দূর করে সত্য হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠা করা। প্রথম বইটি ছিলো "গো মাতার জন্য একজন হিন্দুর সংগ্রাম" এতে গো মাংস খাওয়ার মিথকে খণ্ডন করা হয়েছে। এই বইটি হিন্দুধর্মের দ্বিতীয়

অভিযোগ, 'জন্মের ভিত্তিতে বৈষম্য' এটিকে চিহ্নিত করেছে। পাঠক এটা আবিষ্কার করে অত্যন্ত অবাক হবেন যে, এই সকল অভিযোগগুলো মিথ্যা। বিপরীতে, হিন্দুধর্ম হলো সাম্যতা, মেধা ও ন্যায়ের এক মহান দর্শন। এটি বর্তমান সিস্টেমের চেয়েও অনেক বিকশিত, বর্তমান সিস্টেম মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান ও ইসলামী যুগের কুসংস্কারকে মুছে ফেলতে পারেনি।

খ্রিস্টান সিস্টেম ধরে নেয় যারা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে এবং বাইবেলকে ঈশ্বরের নীতিমালা হিসেবে মেনে নেবে না, তারা নরকে যাবে। ইসলামী সিস্টেম বিশ্বাস করে, যারা মুহম্মদকে শেষ নবী ও কুরাণকে চুড়ান্ত গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করবে না, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের আগুনে নিরন্তর দহন করবেন। উভয় সিস্টেমটা ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে খোলাখুলিভাবে দাসপ্রথাকে সাপোর্ট করে। ধর্মীয় গ্রন্থগুলো, ঈশ্বরের বাণী হিসেবে বিবেচিত হয়, এমনকি এগুলোতেও বিস্তারিত বর্ণনা আছে কিভাবে দাস ও যৌনদাসীদেরকে ব্যবস্থাপনা করতে হবে, যদি এই বইগুলোর বর্তমান প্রচলিত অনুবাদগুলোকে সত্য হিসেবে ধরে নেয়া হয়।

হিন্দুধর্ম আলাদা। বেদ ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থগুলোকে ঈশ্বরের বানী হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। এবং বেদ যেকোনো ধরনের অসাম্যতা, সেটা জন্মভিত্তিক, লিঙ্গভিত্তিক, বিশ্বাস ভিত্তিক, অঞ্চল ভিত্তিক যেকোনটাই হোক না কেন, তাকে এত কঠিনভাবে বাতিল করে যে, এমনকি আধুনিক বিচার ব্যবস্থাও রাজনৈতিক কারনে এভাবে বাতিল করতে সাহস করবে না। বেদ অর্থ জ্ঞান। বেদ উন্মুক্তভাবে ঘোষনা দেয় যেকোনো ধরনের বিচারবুদ্ধিহীন ও যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস দুঃখের প্রস্তুতপ্রনালী। বেদের প্রামাণিকতা নিয়ে প্রশ্ন করাটা শুধু গ্রহণযোগ্যই না বরং এটিকে উৎসাহিত করা হয়। এজন্যই আপনি দেখবেন হিন্দু ধর্মের আওতায় এত বেশি শাখা ও দল। যেটা প্রয়োজন তা হলো উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা।

অথর্ববেদ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, এই জগতে সদা ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বিশ্বাস ব্যবস্থার ভিন্নতা থাকবে। সভ্য লোকেরা অবশ্যই তাদের ভিন্নতা নির্বিশেষে পুরো মানব সম্প্রদায়কে একটি পরিবার বলে গন্য করবেন।

হিন্দুধর্মের উপর অভিযোগের উৎসগুলোকে তিনটি বৃহৎ শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

• ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও ঘটনার ভিত্তিতে অভিযোগ।

• ধর্মীয় গ্রন্থ যেমন রামায়ন, মহাভারত, পুরাণ, স্মৃতি, সুত্র ইত্যাদির ভিত্তিতে অভিযোগ।

• বেদের ভিত্তিতে অভিযোগ।

একটি সুবিধাজনক কিন্তু ভিত্তিহীন ধারনা আছে, যা কিছু অতীতে ঘটেছে বা যা কাছু সংস্কৃতে লিখা আছে সেটাই হিন্দুধর্মের অংশ।

সত্য থেকে এটি বহু দূরে। ঠিক যেভাবে লেবাননের প্রতিটা আরব বেলি নৃত্যের সংখ্যা ইসলামের বার্তা নয়, ইংরেজীতে প্রতিটা পুত্র ও প্রেমিক ও ললিতা বাইবেল নয়। একইভাবে, প্রতিটা সংস্কৃত শব্দ হিন্দুধর্ম নয়।

একই ভাবে, যেভাবে বাবর তার সমকামী সঙ্গী 'বাবরী' র নামে বাবরী মসজিদ তৈরী করেছেন, এটা যেমন ইসলামী কোনো কিছু নয়, পোপ জন ১২ এর ব্যাভিচার ও অযাচার কেলেঙ্কারী খ্রিস্টান ধর্মের কিছু নয়; সেভাবেই কোনো ব্যাক্তির কর্মকাণ্ড হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এমনকি যদি পুরো জগৎ ক্রোধ ও ঘৃণায় আসক্ত হয়ে যায় এটা হিন্দুকে ক্রোধ ও ঘৃণা বানায় না। হিন্দুধর্ম শ্বাশত ধারনার ভিত্তিতে তৈরী। তাই, ক্রোধ ও ঘৃণা সবসময়ই হিন্দুবিরোধী।

অখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ হতে ইতিহাসের নির্বাচিত অধ্যায় ও উদ্বৃতি নিয়ে গঠিত অভিযোগ হিন্দুধর্মের সাথে প্রাসঙ্গিক নয়। এ ধরনের কোনো অভিযোগ হতে সকলেই উপসংহারে পৌছাতে পারেন, সেই যুগে যা ঘটেছে বা কোনো গ্রন্থে যা কিছু লেখা হয়েছে বা সমাজে যা কিছু অনুশীলন করা হয়েছে তা ছিলো হিন্দু বিরোধী।

অভিযোগের দ্বিতীয় শ্রেণিবিভাগটি মহাভারত, রামায়ন, স্মৃতি ও পরবর্তী যুগের অন্যান্য গ্রন্থগুলোর উপর ভিত্তি করে করা হয়, এটিও হালে পানি পায় না। এই শ্রেণির বেশিরভাগ অভিযোগগুলো স্রেফ নির্দিষ্ট সংস্কৃত শব্দের অপ্রাসঙ্গিক ভুল ব্যাখ্যা। আপত্তিকর মন্ত্র বা গল্প সম্পর্কিত কিছু অভিযোগ আছে। কিন্তু এগুলোও যুক্তিপূর্ণ নয় কারন এই বাণীগুলো নিজেরাই ঘোষনা করছে সেগুলো মানব রচিত, এবং ভুল ও বিকৃত হওয়ার

প্রবণতা আছে সেগুলোতে, এবং এগুলো চুড়ান্ত কর্তৃপক্ষ নয়। ধর্মের ব্যাপারে তারা বেদকেই চুড়ান্ত কর্তৃপক্ষ আরোপ করে। এবং বেদের অনুবাদের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা, যুক্তি ও সমবেদনার উপর বেদ চুড়ান্ত কর্তৃপক্ষ আরোপ করে।

এটা জ্ঞাত বিষয় যে, বেদ ছাড়া হিন্দুধর্মের আর কোনো গ্রন্থকেই সযত্নে রক্ষা করা হয় নি। এই অন্য গ্রন্থগুলো ভেজাল মিশ্রিত এবং এমনকি আজকের দিনেও এগুলোর বিভিন্ন সংকলন পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলো রূপক কাহিনী, গল্প, উপমা ও অন্যান্য সাহিত্যিক উপাদানের মাধ্যমে ভুল ও শুদ্ধের বৃহৎ ছবি ব্যাখ্যা করে থাকে। এইগ্রন্থগুলোতে ভেজাল মন্ত্রও থাকতে পারে।

সর্বোপরি, এইগুলো যে আমলে লেখা হয়েছে সে আমলে কপি রাইট আইন, এমক্রিপশন, রিড অনলি ডিভাইস ও DRM প্রচলিত ছিলো না। যে কেউ কিছু কলাপাতা তুলে নিত, ময়ূরের পাখনা দিয়ে কলম বানিয়ে নিত, এবং যা মনে আসে তাই লিখতো। বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার জন্য, হাজার হাজার বছরে প্রতিটা গ্রন্থের অসংখ্য সংকলন জন্ম না দেয়াটাই বরং অকল্পনীয় ব্যাপার।

এ জন্যই হিন্দুধর্ম যে কোনো গ্রন্থ, যে কোনো গল্প, ও যে কোনো ইতিহাসের উর্দ্ধে। যে কোনো গ্রন্থ থেকে উপকার পেতে হলে তার যুক্তিপূর্ণ ও বিবেকের নিকট আকর্ষনীয় বিষয়টিকে গ্রহণ করতে হবে এবং মূল্যহীন লেখাকে বাতিল করে দিতে হবে। যেখানে কেউ শুদ্ধ ও ভুলের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না সে বিষয়ে উপর খোলা মনের হতে হবে। অহিংসা, সত্য, ধৈর্য্য, আত্মনিয়ন্ত্রন, সমবেদনা, বিচক্ষনতা ও পরার্থপরতার মূলনীতির মাপকাঠির উপর স্রেফ বিবেককে অনুসরন করুন।

হ্যা, রামায়ন, মহাভারতে, পুরাণে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক আছে। কিছু স্মৃতি, সুত্র আর পুরান তো সম্পূর্ণ জাল, এবং এগুলো অবিজ্ঞ দুষ্ট মানসিকতার লোকেরা লিখেছে। উদাহরণস্বরূপ ভবিষ্য পুরাণে রানী ভিক্টোরিয়া ও আকবরের প্রশংসা আছে। সম্ভবত ব্রিটিশরা কিছু সংস্কৃত সাহিত্যিককে বেতন দিয়ে নিয়োগ করেছিলো কিছু শ্লোক উদ্ভাবন করার জন্য, যে শ্লোকগুলো সানডে, মানডে ইত্যাদি (সপ্তাহের নাম) ব্যাখ্যা করবে এবং ভিক্টোরিয়াকে

(ইকাতাবাদ) মহান শাসক হিসেবে বর্ণনা করবে।

যুগের পর যুগ ধরে, ভারতের পণ্ডিতরা এই ধরনের কিছু বিপথে পরিচালিত ব্যাক্তির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তাঁরা জানতেন এ ধরনের লোকেরা জালি গ্রন্থ লিখতে পারে এবং জনগনকে বিভ্রান্ত করতে পারে। তাঁরা বেদকে চুড়ান্ত মানদণ্ড হিসেবে স্থাপন করেন। সবকিছুই গ্রহণযোগ্য হবে যদি সেটি বেদ অনুসারে গ্রহণযোগ্য হয়। আপনি এই মানদণ্ড দেখতে পারেন "শ্রুতি প্রমাণ"- প্রতি যুগের গ্রন্থসমূহে বেদই শুধুমাত্র প্রামাণ্য।

এবং বেদ এতটাই নির্ভুলতার সাথে সংরক্ষিত হয়েছে, বেদের প্রতিটা অক্ষরই বিশুদ্ধতার প্রমাণ হতে পারে।

মহাভারত এতবার প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে যে, কিছু মূল্যায়ন অনুসারে বর্তমান মহাভারতে আসল মহাভারতের দশগুন প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। কিছু অতি বুদ্ধিমান পণ্ডিত মহাভারতে কিছু শ্লোক যুক্ত করেছেন, যেগুলোতে আছে, "বদমাশ লোকেরা মহাভারত প্রক্ষিপ্ত করে আসছে। যাহোক, প্রত্যেকের জানা উচিত, প্রকৃত মহাভারত সম্পূর্ণভাবে মাংস, মদ ও ব্যাভিচারের বিরোধী।"

কৃষ্ণের সাথে রাধা চরিত্রটি যুক্ত করা হয়েছে মূল নায়ককে লাম্পট্য দোষে অভিযুক্ত করার জন্য, এটিও জালি গ্রন্থ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। অন্য কোনো গ্রন্থে রাধার নামটি উল্লেখ পর্যন্ত নেই। রাধা শব্দটির অর্থ "সাফল্য সম্পর্কিত পথ"। ইতিহাসের কোনো পরিক্রমায়, কেউ হয়তো কৃষ্ণের সাফল্যকে ব্যাক্তিরূপে প্রকাশ করেছে আর রাধা নামকরন করেছে। কিন্তু এটি আরো সৃষ্টিশীলতার পথকে উন্মুক্ত করেছে আর অধিক কাহিনী যুক্ত হয়েছে। প্রেমের মসলা সৃষ্টি করা হয়েছে, ধর্মীয় অনুভুতির সাথে মিশ্রন হয়েছে এবং রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে ঘিরে পুরো কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। লেখরা এমন এমন জায়গায় পৌছতে পারেন যেখানে সূর্যালোকও পৌছতে পারে না! এবং আজ, কৃষ্ণ ছিলেন সর্বোচ্চ আত্মসংযমী, প্রগতিশীল, বুদ্ধিমান ব্যাক্তি, এ সিদ্ধান্তে আসার জন্য সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকা সত্বেও, তাঁকে প্লেবয় হিসেবে কলুষিত করা হয়েছে।

রামায়নও স্থুলভাবে প্রক্ষিপ্ত হওয়া আরেকটি গ্রন্থ। পুরো উত্তর রামায়ন সম্পূর্ণটাই প্রক্ষিপ্ত, এই অংশেই আছে সীতার নির্বাসন ও শম্বুক হত্যার গল্প। সংস্কৃতের বেসিক জ্ঞান যাদের আছে, তাদের সবাই উত্তর রামায়নের ভাষা, স্বর, এবং ধরন দেখেই এটা চিহ্নিত করতে পারেন যে, এই উত্তর রামায়নটি আসল রামায়নের হাজার বছর পরে অন্য কোনো ব্যাক্তি এটি লিখেছেন।

এমনকি মূল রামায়নেও সীতার অগ্নি পরীক্ষার ন্যায় বেশ কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে, যদি কেউ সংস্কৃত টেক্সট ধারাবাহিকভাবে পড়ে যায় সে নিশ্চিতভাবে ধরতে পারবে। এবং এই প্রক্ষিপ্ত অংশ এমন অনেক হিন্দু বিরোধী নারী আন্দোলনের মূল ভিত্তি হয়ে গেছে!

অনেক সাহিত্য একাডেমী ও ফিল্ম এওয়ার্ড প্রত্যাহার করতে হবে, এত এত হিন্দু বিরোধী সংস্থা ও আন্দোলন অর্থহীন হয়ে যাবে যদি সত্যটি গ্রহণ করে নেয়া হয়, এত এত শিল্পকর্ম (works of art) মিথ্যাকর্মে পরিনত হয়ে যাবে - কারন হিন্দুধর্মের সমালোচনা কল্পনার উপর ভিত্তি করে হয়েছে। এই কল্পনাগুলোকে সত্য হিসেবে প্রচারের মধ্যেই তাদের টিকে থাকা নির্ভর করে। (একই ভাবে, এটা খুব ভালো লক্ষন যে, অনেক এওয়ার্ড বিজয়ী যাদের জীবন হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ঘৃণার একটা গল্প হয়ে গেছে, যুক্তিসঙ্গতভাবে তাদের পুরষ্কার ফিরিয়ে দিতে হবে।)

১৩০০ বছরেরও বেশি বিদেশী আক্রমন এই বিভ্রান্তিগুলো যুক্ত করেছে। এবং তারপর ভালো মানসিকতার হিন্দুধর্মপ্রেমীরা হিন্দু বিরোধী ভাবাদর্শের লোকেদের সমালোচনার জবাব দিতে শুরু করেছে। উভয় পক্ষই মিথ্যাকেই আরো সমর্থন করেছে। একপক্ষ বলে, রাম হলো শত্রু কারন সে শূদ্রকে (নিচু জাতের ব্যাক্তি) হত্যা করেছে বেদ পাঠের জন্য। অন্যপক্ষ রামকে নায়ক হিসেবে তুলে ধরার জন্য তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়েছে এবং হত্যার হাস্যকর ব্যাখ্যা দিয়েছে - কেউ বলেছে অলৌকিক ঘটনা, ত্রেতা যুগে ভিন্ন আইন থাকা, কেউ মাকে অভিশাপ দিয়েছে, কেউ হত্যায় বিজ্ঞান খুঁজেছে, কেউ বলেছে শূদ্র নিহত হয়ে স্বর্গ পেয়েছে ইত্যাদি।

সর্বশেষে যেটা হলো, উভয় পক্ষ রামকে হিন্দুধর্মের মাপকাঠি বানিয়েছে এবং মেনে নিয়েছে, তিনি শূদ্রকে হত্যা করেছেন। তাই, রামকে দানব

বানানো হয়েছে। উভয়পক্ষের কেউই, তাদের আবেগ ও সংস্কারের জন্য, প্রথমেই এই পুরো অধ্যায়টিই জালি হওয়ার সম্ভাবনাকে পরীক্ষা করতে পারে নি।

এই পাগলামী হিন্দুধর্মকে নিষ্প্রভ করেছে যুগ যুগ ধরে এবং বর্তমানে হিন্দুধর্ম একটি জটিল পর্যায়ে পৌঁছেছে। যতক্ষন না আমরা সত্যিকারের ভিত্তিটিকে পুনরুদ্ধার করতে না পারব এবং ভ্রান্তধারনাগুলোকে ধ্বংস করতে না পারব, আমরা হাজার হাজার বছরের সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়ে ফেলার ঝুঁকিতে থাকব, যে জ্ঞান হিন্দুধর্ম তাঁর গর্ভে সযতনে রক্ষা করেছে। অর্থহীন বিষয়াসক্তি এবং অন্ধবিশ্বাসী ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের এই যুগে, এইটি আরো অধিক জটিল হয়ে গেছে।

হিন্দুধর্মের উপর চুড়ান্ত অভিযোগটি আসে বৈদিক মন্ত্রগুলোর অনুবাদের উপর, যেগুলো জাত ভিত্তিক ঘৃণার কথা বলে, লিঙ্গ সাম্যতার কথা বলে, অসভ্যতা, মাদকতা, গোমাংস আর কি নেই। অনলাইন মঞ্চে এটা খুব সাধারন বিষয়, বেদের কিছু শ্লোক উচ্চারন করা, sacred-texts.com ইন্টারনেট লিঙ্ক থেকে রেফারেন্স দেয়া, একটি হাস্যকর অনুবাদ উপস্থাপন করা এবং সিদ্ধান্তে আসা, বেদ তথা হিন্দুধর্ম একটি বাজে বিষয়।

এই পথ অবলম্বন করা বর্তমান সময়ে আরো জনপ্রিয় হয়ে গেছে, অগ্নিবীরের প্রচেষ্ঠায় কোনঠাসা হয়ে যাওয়া হিন্দু বিরোধীদেরকে বেদ ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে রেফারেন্স দেওয়া বন্ধ করতে বলার পর থেকে।

এই ধরনের পথের একটা অসুবিধা হলো, এই অনুবাদগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই অনুবাদগুলোর লেখকদের মধ্যে আছে হয় ম্যাক্সমুলার, গ্রাফিথ অথবা মনিয়ের উইলিয়ামস। যদি আপনি তাদের অন্যান্য কর্মগুলো পুনর্বিবেচনা করেন, আপনি তাদের অনুবাদগুলোর অযৌক্তিকতার পরিষ্কার কারন খুঁজে পাবেন। তারা ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশদের বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিলেন, তাদের পরিষ্কার উদ্দেশ্য ছিলো হিন্দুধর্মকে খারাপভাবে চিত্রায়িত করা। মনিয়ের খোলাখুলি লিখেছেন, তার এজেণ্ডা হলো ভারতে যীশু খ্রিস্টকে সংবর্ধিত (promote) করা। তাদের অনেকে সায়নের মত মধ্যযুগের পণ্ডিতের রচনার উপর ভিত্তি করে তাদের অনুবাদ কর্ম করেছেন, যিনি (সায়নাচার্য) ইসলামী আক্রমনের যুগে তার রচনা কাজ

সম্পাদনা করেছিলেন।

অগ্নিবীর নিঁখুতভাবে বেদের প্রতিটি মন্ত্র পড়েছে, প্রতিটি অভিযোগকে দেখেছে, এবং সকল অভিযোগের অযৌক্তিকতা খুঁজে পেয়েছে। আমরা কয়েক বছর আগে চার বেদের ২০০০০ এরও বেশি মন্ত্রে কোনো আপত্তিকর মন্ত্র আছে এমনটা দেখানোর জন্য একটি উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। আমরা এখনো পর্যন্ত কারও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হইনি।

আমরা আশা করি এই সিরিজ জগতের কাছে আমাদের ভুলে যাওয়া মানবতার আসল দর্শনকে নিয়ে আসবে। অসহিষ্ণুতার পাগলামী ও অন্ধ বিষয়াসক্তির এই যুগে এটা সময়ের দাবী। আমরা আশা করি আপনি একটি নতুন দিকনির্দেশনা পাবেন মানবতার উৎস হিন্দুধর্ম থেকে।

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য রাখুন এই বই বিক্রি হতে প্রাপ্ত সকল অর্থ সত্য ধর্ম হিন্দুধর্মকে সংবর্ধিত করার কাজে ব্যবহৃত হবে। এই বইটিকে শেয়ার করে, বিলি করে, উপহার দিয়ে আমাদেরকে মানবতার সেবা করতে সাহায্য করুন। এছাড়াও, আপনার পর্যালোচনা ও প্রশংসা পাবলিক প্লাটফর্মে শেয়ার করুন।

আপনি অবশ্যই ধর্মকে (ন্যায়পরায়নতা) রক্ষা ও পালন করবেন। তখন ধর্মও আপনাকে রক্ষা ও পালন করবে।

সঞ্জিব নেওয়ার

সূচীপত্র

১ম অংশঃ জাত প্রথার বাস্তবতা

অধ্যায় ১

জাত ব্যবস্থার বাস্তবতা

এই অধ্যায়টা বিশেষ করে ঐ মানসিকতার লোকেদের জন্য যারা জন্ম ভিত্তিক বর্ণ বৈষম্যকে সমর্থন করে। আমাদের ভাষা ও সমালোচনা এই ঘৃণ্য রীতি ও এর সমর্থকদের প্রতি লক্ষ্য করে, সাধারণ কোনো ব্যাক্তি, সম্প্রদায় বা কোনো বর্ণকে উদ্দেশ্য করে না। আমরা (জন্মভিত্তিক) বর্ণবাদকে একটা নিকৃষ্ট সন্ত্রাসবাদ মনে করি আর এই অপরাধে যারা অপরাধী তাদেরকে দস্যু মনে করি। বরং তথাকথিত উচ্চ নিম্ন বর্ণ নির্বিশে-ষে আমরা বাকীরা সকলে এক পরিবার এক গোষ্ঠী, এক বর্ণ। এই উচ্চ নিম্ন জাতপাত মানব নির্মিত এবং ভ্রান্ত। আমরা পাঠকদের অনুরোধ করছি এই অধ্যায়কে 'বসুদৈব কুটুম্বকম' এই বৈদিক মানসিকতার কাউকে উদ্দেশ্য করে বিবেচনা করবেন না।

আমাদের সকলেরই বর্ণ ব্যাবস্থার কিছু বাস্তবতা সম্পর্কে জানা উচিত ও এটি নিয়ে চিন্তা করা উচিত।

ব্রাহ্মণ কে?

জন্মভিত্তিক বর্ণ ব্যবস্থার সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপারটি হলো, এটি একটি

যাচাই অযোগ্য মুখের দাবীর উপর প্রতিষ্ঠিত! বর্তমান ব্রাহ্মণরা অতীতের ব্রাহ্মণদের প্রকৃত সন্তান কিনা এই সত্য উদঘাটন করার কোনো উপায় নেই। গোত্র বা ঋষি নাম নির্বিশেষে এই দাবীর সত্যতা নিরূপন করার কোনো উপায় নেই।

কি হবে? যদি আমি দাবী করি, বর্তমান সময়ের (জন্ম ভিত্তিক) ব্রাহ্মণরা আসলে শূদ্রদেরও অধম কারন তারা প্রায় ১০০০ বছর আগে চণ্ডালদের থেকে জাত। কেউ এ দাবী কীভাবে খণ্ডণ করতে পারবে? যদি কেউ বলে এই ব্রাহ্মণ পরিবাররা ভরদ্বাজ গোত্র থেকে এসেছে, তাহলে আমি তখন এই দাবী সত্যতা যাচাই করতে ডিএনএ টেস্টের দাবী জানাব। এর অনুপস্থিতিতে উচ্চ বর্ণের যে কোনো দাবী স্রেফ অসার দাবী। এ জন্যেই প্রকৃত মনুস্মৃতি (বর্তমানে প্রচলিত প্রক্ষিপ্তটি নয়) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, কারোরই তার বংশ গৌরবের অহঙ্কারের মাধ্যমে কোনো সুবিধা অর্জন করা উচিত না।

ক্ষত্রিয় কে?

কথিত আছে পরশুরাম বিভিন্ন সময়ে সকল ক্ষত্রিয়কে ধ্বংস করেছেন। সুতরাং এটা নিশ্চিত, আজকের ক্ষত্রিয়রা অন্য যেকোনো কিছু হতে পারে, কিন্তু জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয় না।

যদি কেউ রাজপুতদের বংশতালিকা অনুসরণ করে, তারা নিম্নলিখিত বংশের অন্তর্গত হতে পারেঃ সূর্যবংশী বা সূর্য হতে, চন্দ্রবংশী বা চন্দ্র হতে, অগ্নিকুল বা অগ্নি হতে। অবশ্যই কেউই সূর্য বা চন্দ্র থেকে পৃথিবীতে আসেনি। এছাড়া অগ্নিকুল হলো সাম্প্রতিক জাতিগোষ্ঠী!! কিংবদন্তী কথা প্রচলিত আছে, অগ্নিকুল রাজপুত আগুন থেকে জন্ম হয়েছে যখন পরশুরাম এই পৃথিবী থেকে সমস্ত রাজপুত বা ক্ষত্রিয়দেরকে মুছে দিয়েছিলেন। অনেক রাজপুত গোষ্ঠীর এখনো দ্বিধা রয়েছে, তারা কি সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী না অগ্নিকুল থেকে হয়েছে।

অবশ্যই এই বর্তমাণ উপকথাগুলো, কোনো প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এর অর্থ হলো বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যারা সৈনিককে পেশা হিসেবে নিয়েছিলো, তারা বিভিন্ন সময় রাজপুত হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

উচ্চ বর্ণ চণ্ডাল হতে পারে

যদি তথাকথিত কিছু উচু জাতের লোকেরা, অন্য কিছু লোককে নিচু জাতের দাবী করতে পারে, তাহলে আমিও দাবী করতে পারি - এই নি- চুজাতের লোকেরাই আসল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। এবং উচু জাতের লোকেরাই আসলে চণ্ডালের বংশধর, এরা শত শত বছর আগে থেকে ক্ষমতা করায়ত্ত করে রেখেছে এবং ঐতিহাসিক রেকর্ডপত্র মুছে দিয়েছে। নথিভুক্ত ইতিহাসের সাথে বিভিন্ন অলৌকিক গল্পের সাথে মিশ্রনে বিভিন্ন জাত ও গোত্রের উৎপত্তি এই দাবীকে সমর্থন করে যে, উচু জাতের লোকেরাই আসলে চণ্ডালের বংশধর।

এখন যদি 'উচু জাতের লোকেরাই আসলে চণ্ডালের বংশধর' এটি শুনতে অপমানজনক শোনায়, তাহলে যেকোনো মানব সম্প্রদায়কে নিচুজাত বলে ডাকাটাও সমান অপমানজনক।

আমাদের মধ্যে ম্লেচ্ছ কারা?

ইতিহাসের রেকর্ডপত্র থেকে যে কেউ জানতে পারে, শক, হুন, গ্রীক, মোঙ্গল ইত্যাদি ক্ষমতার অবস্থানে ভারতীয় সমাজে অঙ্গীভুত হয়ে আসছে। তাদের অনেকেই ভারতের বিভিন্ন অংশে উল্লেখযোগ্য সম- য়কাল শাসন করেছে। আজকে আমাদের মধ্যে কে গ্রীক, কে হুন, কে মোঙ্গল এটা আলাদা করা অসম্ভব। 'সকল মানুষ এক জাতি' এই বৈদিক ধারনার সাথে এটি খুব ভালোভাবে যায়, কিন্তু জন্মভিত্তিক বর্ণ ব্যবস্থার ভিত্তিকে এটি উৎসাহিত করে। তাদের কারনেই ম্লেচ্ছরা এই চারবর্ণের চেয়েও নিকৃষ্ট।

জাতি বৈষম্যের কৌশলের খোঁজে

বেদে জাতপ্রথা সমর্থন করেছে না বাতিল করেছে সেটা ভুলে যান। এটা মূল বিষয় নয়। আমরা ইতিমধ্যেই দেখিয়েছি বেদ জন্মভিত্তিক ও লিঙ্গ- ভিত্তিক বৈষম্যের নূন্যতম ধারনারও বিরোধী।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমাদের মধ্যে কারা বেদের শুরু থেকে বংশগ- তভাবে উচ্চবর্ণ আর কারা নিম্নবর্ণ এটা নির্ধারণ করার কোনো উপায়ই

আমাদের কারোর নেই৷ স্বঘোষিত ফাঁপা আত্ম-ঘোষনার দাবী ছাড়া কারো বর্ণকে গুরুত্বের সাথে নেওয়ার মত কংক্রিট কিছু নেই!

যদি বেদ জন্মভিত্তিক বর্ণ প্রথাকে সমর্থন নাও করে, কারো বর্ণ নির্ধারণ করার জন্য তাদের কিছু বিশেষ নির্ভরযোগ্য কৌশল আছে৷ ঐ কৌশল না থাকলে পুরো জন্ম ভিত্তিক বর্ণ ব্যবস্থা মুখ থুবরে পড়বে৷

অনেকে বলতে পারে জাতপাত ব্যবস্থা বেদের শুরুর দিকে প্রাসঙ্গিক ছিলো কিন্তু আজকের যুগে এর কোনো মানে নেই৷

এ প্রসঙ্গে আমাদের অবস্থান (বেদ ও যুক্তির ভিত্তিতে), জাতপাতপ্রথা কখনোই প্রাসঙ্গিক ছিলো না, বরং এটা বৈদিক ভাবাদর্শের বিকৃতি৷ এবং এটার জন্য আমাদের সমাজকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে, এই জাতপ্রথা আমাদের সম্মান, শক্তি ও ভবিষ্যৎকে ছিনিয়ে নিয়েছে৷

একটি নামে কি হয়?

অনুগ্রহ করে টুকে রাখুন, নাম এবং পদবীর ব্যবহার মাত্র কয়েক শতাব্দী পুরোনো৷ আপনি প্রাচীন সাহিত্যগুলোর কোথাও 'রাম সূর্যবংশী' বা 'কৃষ্ণ যাদব' এমন নাম পাবেন না৷ এমনকি আজকের দিনেও বেশির-ভাগ সংখ্যক পদবী গৃহীত হয়েছে পেশার ভিত্তিতে, গ্রাম বা শহরের ভিত্তিতে! দক্ষিন ভারতীয়রা সাধারণত মাতাপিতার দেয়া নাম, গ্রামের নাম ইত্যাদির সমাহারে নাম ব্যবহার করে৷ আজকাল খুব সামান্য কিছুই পদবী আছে যেগুলো বেদের শুরুর দিকের পদবী ছিলো৷

বাস্তবটা হলো প্রাচীন সমাজে পদবী ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হতো, এটা ইঙ্গিত দেয় তৎকালীন লোকেরা নিজেদের মেধা ও যোগ্যতা দিয়েই সম্মানিত হতো, তাদের জন্ম-ছাপ দিয়ে নয়৷ লোকেরা গোত্র পরিচয় বহন করতো না, খুব দূরের কোনো জায়গায় যেতে নিরুৎসাহিতও করা হতো না, যেমনটা বরং হিন্দুধর্মের অন্ধকার দিনগুলোতে হতো৷ কারো গৌত্র পরিচয় যাচাই করার কোনো উপায় ছিলো না৷ একজন ব্যাক্তির মেধাই ছিলো তার প্রকৃত গোত্র! অবশ্যই সময়ের সাথে আত্মকেন্দ্রিক উদ্দেশ্য থেকে এই বিকৃতি ঘটেছে৷ আমরা এখন দেখি, বলিউডের সিনেমা জগৎ ও রাজনীতিও এখন জন্মভিত্তিক হয়ে গেছে৷ অযৌক্তিক জন্ম ভিত্তিক

বর্ণপ্রথাকে শক্তিশালী করতে একই বিষয়গুলো প্রভাব ফেলেছে। তবুও, (জন্মভিত্তিক) বর্ণের ভিত্তি ও এর সত্যতা সবসময়ই অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য ছিলো।

যদিও কেউ কেউ দাবী করে 'শর্মা' ব্রাহ্মণদের প্রাচীন পদবী। রামায়ন মহাভারতের যুগে বাধ্যতামূলকভাবে পদবীর ব্যবহার ছিলো কিনা এটা বিতর্কিত। আমরা স্রেফ এটুকুই বলতে পারি যে, আমরা কাউকে 'শর্মা ব্রাহ্মণ' হিসেবে অনুমান করি যেহেতু সে এই পদবী ব্যবহার করে। হয়তো তার বাবা ও দাদু এই পদবী ব্যবহার করতো। কি হবে, যদি আমি এই শর্মা পদবী ব্যবহার করতে শুরু করি, এবং আমার পুত্র এটা অনুসরন করে? কিভাবে তুমি বলবে, আমি সত্যিকারে একজন চণ্ডাল না ব্রাহ্মণ? তোমাকে স্রেফ আমার দাবীর উপর নির্ভর করতে হবে। অধিকন্তু আমি যদি বোকা না হই, স্বীকার না করি যে, আমি চণ্ডালের বংশধর কিন্তু ব্রাহ্মণ হওয়ায় এটি আমাকে একচেটিয়াভাবে অনেক অধিকার ও সুবিধা দিয়েছে, তখন?

মধ্যযুগের আক্রমণগুলো

পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার ধর্মান্ধ গোত্রগুলোর আক্রমণ কার্যত পুরো শহর নগর সমূহ ধর্ষনের সাক্ষ্য বহণ করেছিলো। ভারতের ইতিহাসের এই অন্ধকার যুগ জুড়ে নারীরা এর প্রধান শিকারে পরিনত হয়েছে। যখনই লুটেরা কাসিম, ঘোরী, গজনী, তাইমুর আক্রমণ করেছে, তারা নিশ্চিত করেছে একটি ঘরের নারীরাও যেন তাদের সৈনিকদের ধর্ষনের হাত থেকে বাদ না যায়। দিল্লী নিজে বিভিন্ন সময় ধ্বংস হয়েছে। পুরো উত্তর পশ্চিম ভারত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মধ্য এশিয়া থেকে আসা লোকেদের নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছে। এমন দূর্ভাগ্য যেন কখনো কোনো সমাজের উপর পতিত না হয়। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা এসব দেখেছেন। এখন যারা এ নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছেন এই তথাকথিত বর্ণপ্রথায়, তাদের সন্তানদের 'জাতিচ্যুত' ছাড়া আর কি বলে ডাকা হবে? কিন্তু প্রশংসাজনকভাবে এমনটা হয়নি।

আমাদের দার্শনিকরা জানতেন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নারীরাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তারা মনুস্মৃতিতে প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, একজন নারী যতই অধঃপতিত হোক, সে উন্নত চরিত্র হতে

পারে যদি তার স্বামী উন্নত চরিত্র হয়। কিন্তু স্বামীটিকে নিশ্চিত করতে হবে, সে কখনো অধঃপতিত হবে না।

এই অনুশাসনই তাদের নারীসমাজের মর্যাদা রক্ষায় তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং ভগবান না করুন, যদি ক্ষতিকর কিছু হয় তবুও তারা তাদের নারীদের গ্রহণ করবেন, আর নতুন করে তাদের জীবন শুরু করবেন। বিধবাদের পুনরায় বিয়ে দেয়া হবে, ধর্ষনের শিকার নারীদের উদ্ধার করা হবে। এটাই কি সেদিনও হয়নি। যদি তা না হতো, দখলদারদের কয়েকটি আক্রমনের পরে আমরা হয়তো জাতিচ্যুতদের আধিপত্য আছে এমন সমাজে বাস করতাম!!

অবশ্যই, পরবর্তী সময়ে নারীদের সন্মানকে ভ্রান্তভাবে মোহনীয় করা শুরু হলো, এতে বিধবা অথবা ধর্ষনের শিকার নারীদের জন্য বিকল্প রইলো শুধু মৃত্যু, অত্যাচার বা বেশ্যাবৃত্তি। এই বোকামী স্রেফ আমাদেরকে আরো শক্তিহীন করে দিলো।

কিছু জন্মভিত্তিক উচ্চবর্ণের লোকেরা যুক্তি দেখাতে পারে, এটি একটি প্রকৃত ঘটনা, যেটি প্রমাণ করে একজন ধর্ষনের শিকার নারীকে জাতিচ্যুত করা হতো। (আমাদের বক্তব্য হলো) যদি এটা হয়েও থাকে এটা আমরা স্রেফ এটাকে বলব এটা হলো বিপথগামীতার একটা সীমা।

বাস্তবতা হলো জাতপ্রথা এর রূপরেখাগতভাবে, ব্যাবহারিক দিক দিয়ে কখনই এটা হিন্দু ধারনার অংশ ছিলো না। এটা আবির্ভুত হয়েছে শ্রেণী বা পেশা ভিত্তিক গোষ্ঠীবদ্ধ বসবাস থেকে এবং ১৪০০ বছরের জিহাদী আক্রমণের অধীনে শোচনীয় অবস্থা থেকে, এই জিহাদী আক্রমণ বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীকে নিম্নমানের কাজ করতে বাধ্য করেছে এবং ধর্ষন ও হত্যার নিয়মিত ভয় তাদের স্বাধীন ও নিরাপদ ভ্রমণকে সীমিত করে দিয়েছে।

জাতিভেদ প্রথায় কোনোকিছুই হিন্দু নেই।এটি একটি সামাজিক রীতি যা আমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা মুখোমুখী হওয়া হুমকির ফলেই উদ্‌ভূত হয়েছিল।

বাস্তবে পূর্বপুরুষ নিয়ে গৌরব করা একটি মহৎ বিষয়।আমাদের সকলে-রই নিজেদের পূর্বপুরুষ তথা তাঁদের কৃতিত্ব নিয়ে গর্ব করা উচিত।আজ

আমরা যতটুকু এগিয়েছি তা পূর্ণত তাঁদের ই অবদান।তাই এই গর্ববোধ আমাদের পিতৃঋণ। তবে সেই গর্ববোধকে আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হল পূর্বপুরুষের এই প্রাপ্তিকে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়া, আরও উন্নত হওয়া; যারা এই কৃতিত্ব স্বীকার করে তাঁদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা নয়।

অধ্যায় ২

জাতপ্রথার উপর সাতটি পাঠ

এই অধ্যায়ে আমরা জাত ব্যবস্থার উপর সাধারণ পাঠ পর্যালোচনা করব।

পাঠ ১: জাতপ্রথা একটি মিথ্যা ধারণা

জাত ব্যবস্থা একটি মিথ্যা ধারণা এর কোনো বৈদিক ভিত্তি নেই। কোনো একটি মন্ত্রেও জন্মভিত্তিক জাতপ্রথার কোনো সমর্থন নেই।

পাঠ ২: সকল মনুষ্যেরই চারটি বর্ণ আছে

প্রত্যেক মানুষেরই চারটি গুন আছে। সেগুলো হলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। সহজভাবে বলার জন্য, আমরা তাকে তার প্রধান পেশায় চিহ্নিত করতে পারি। অবশ্য এতে একটি স্থূল মূল্যায়ন হয়, এবং এটি বর্তমান যুগে ও সামাজিক প্রক্রিয়ায় তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। যজুর্বে-দের ৩২/১৬ বিশেষভাবে প্রার্থনা করে, আমার ব্রাহ্মণ আমার ক্ষত্রিয় গুন প্রয়োজনীয় হোক।

পাঠ ৩: নির্ধারণ করার কোনো উপায় নেই

বিগত কয়েক হাজার বা এরো অধিক প্রজন্ম ধরে এই তথাকথিত উচ্চ-জাতে লোকেরা আসলেই উচ্চজাতের কিনা, এবং নিম্নজাতের লোকেরা আসলেই নিম্নজাতের কিনা এটা নির্ধারণ করার কোনো উপায় নেই।

এই সকল উচ্চজাতের এবং নিম্নজাতের উদ্ভট গল্পগুলো আত্মমূল্যায়-নের উপর ভিত্তি করে তৈরী, এবং কয়েক প্রজন্ম থেকে প্রচলিত। আমরা দেখি, বর্তমান জাত ব্যবস্থা যে কোন ভাবে উচ্চজাতের মিথ্যা ছাড়পত্র নিতে এবং বাকী লোকদের বোকা বানাতে অসৎ লোকেদের উৎসাহ দান করে। সকল সম্ভাবনায়, জাতভেদপ্রথা অসৎ লোকেদের প্রাধান্যকে ও সৎ লোকেদের অত্যাচারকে সুচিত করে এবং এটা অধিকতর প্রত্যাশিত যে, এতে সৎ লোকেরা নিম্নজাতি হিসেবে পরিচিতি পাবে, এবং প্রকৃত উচ্চজাতির লোকেরা প্রকৃত নিম্নজাতের লোকেদের দ্বারা প্রতারিত হবে। এছাড়াও মিথ্যা উচ্চজাতের কেউ যদি স্বীকার করে তারা চণ্ডাল পরিবার থেকে এসেছে, এতেও কোনো পুরষ্কার নেই কারন এটা তাদের বিশেষ সুবিধা ও অবস্থান থেকে তাকে বঞ্চিত করবে। সবকিছুর উপর জাতব্যবস্থা হলো প্রকৃতপক্ষে প্রতারণার একটি উৎসাহ।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারনে বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিক হয়। কিন্তু.......

আমরা শুধু বলতে পারি, বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিবার বিশেষে প্রধানভা-বে চালু থাকে। পারিপার্শ্বিকতার কারনে নতুন জন্ম নেয়া শিশুরা তা গ্রহণ করে। অনেক পেশা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চালু থাকে। এটাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু তার মানে এই না, শুধুমাত্র ডাক্তারের ঘরে জন্ম নেয়ায় ডাক্তা-রের পুত্র ডাক্তারই হবে। তাকে বড় হতে হবে, পরীক্ষা দিতে হবে, MBBS পাশ করতে হবে, তারপর সে "ডাক্তার" এই সন্মান ব্যবহার করতে পারবে। একই বিষয় প্রত্যেক পেশা ও বর্ণের ব্যাপারে সত্য।

একইভাবে, এটাও বোঝায় না, আমি ডাক্তার হতে পারব না, কারন আমার বাবা একজন শ্রমিক!! কৃতজ্ঞতার বিষয় যে, বিষয়টা এমনটা না। যদি তা হতো, বিশ্ব নরকতূল্য হয়ে যেত। সবকিছুর পর, প্রায় সকল কিংবদন্তী যারা বিশ্বকে তাদের জ্ঞান, আবিষ্কার, প্রাপ্তি ও নেতৃত্ব দিয়ে গঠন করেছেন,

তারা তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের উল্টোস্রোতে ছিলেন।

পাঠ ৪: জাতব্যাবস্থা আমাদের ধ্বংস করেছে

যেদিন থেকে ভারত জাতবর্ণপ্রথাকে গুরুত্বের সাথে নিল, আমাদের অবস্থান পতন ঘটলো, আমরা জগতের আলোকদাতা থেকে পতিত হয়ে পরিনত হলাম বৃহত্তর ঋণ গ্রহীতা ও ভিক্ষুকের জাতিতে। এবং পশ্চিমা বিশ্ব এত বেশি ফাঁক ফোকর (অসামঞ্জস্যতা) থাকা সত্ত্বেও এত উন্নতি করতে পেরেছে, কারন তারা জন্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করতে পেরেছে। (জন্মভিত্তিক) বর্ণ ব্যবস্থার চুড়ান্ত পর্যায়ে আমরা শত শত বছর ধরে নিজেদের ধর্ষিত ও নৃশংসভাবে খুন হতে দেখেছি এবং সবশেষে নিজের প্রাচীন মাতৃভুমিতে বিভক্ত হতে দেখেছি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জন্মভিত্তিক বর্ণপ্রথা উল্লেখজনকভাবে কমে যাওয়ার পর, কিছুটা সাময়িক রেহাই দেখতে পেয়েছি। যাহোক, কিছু উপদ্রব রয়ে গেছে, বর্ণপ্রথার রাজনীতিকীকরন হওয়ায় এটা মুছে যাচ্ছে না। এবং রাজনীতিকীকরন মাথা চাড়া দিচ্ছে কারন আমরা জন্মভিত্তিক বর্ণপ্রথার উপর তৈরী আচার অনুষ্ঠান, ধর্মগ্রন্থ ও রীতিনীতিগুলোকে আবর্জনা হিসেবে ছুড়ে ফেলতে অস্বীকার করছি।

পাঠ ৫: (জন্মভিত্তিক) বর্ণবিদ্বেষী মানসিকতার নেতিবাচক অবদান

যদি আমি বিগত ১০০০ বছরে বর্ণবিদ্বেষী মানসিকতার কারো কোনো উল্লেখযোগ্য অবদানকে উল্লেখ করতে বলি, আপনার এই অতিব ঘাটতিকে দোষী করতে হবে, সকল ষড়যন্ত্র তত্বকে দোষী করতে হবে। যা হোক, বাস্তবতা হলো এই জাতপাতব্যবস্থা ফাঁপা কুসংস্কার, দর্শণ ও রীতিনীতি ছাড়া বারাণসীর সকল পণ্ডিত ও সকল পবিত্র তীর্থস্থান একত্র হয়েও দরকারী কোনোকিছুতেই কখনো অবদান রাখেনি। এই তীর্থস্থানগুলোর অত্যন্ত ধন ও সম্পদের গুপ্তস্থানগুলোতে প্রবেশাধিকার আছে এবং এ সম্পদ দ্বারা তারা দরকারে যে কোনো কিছু করতে পারে। (উদাহরণস্বরূপ পদ্মনাভন মন্দিরে আবিষ্কৃত সম্পদসমূহ। আমি অবাক হয়ে যাই, যদি তারা এ সম্পদগুলো দখলদারদের পরাজিত করার লক্ষ্যে মানুষকে একত্র

করতে এবং যোগ্য নিয়ন্ত্রন স্থাপন করতে ব্যবহার করতো।)

দেব অনুপ্রাণিত জন্ম, জ্ঞান এবং শ্রীহরির আর্শীবাদধন্য এই জন্মভিত্তিক পণ্ডিতদের তুলনায় এই তথাকথিত ম্লেচ্ছ যেমনঃ আইনস্টাইন, নিউটন, ফ্যারাডে সহ পশ্চিমের শত শত পথিকৃতদের অধিকতর উর্বর মস্তিষ্ক ছিলো। বিগত ৩০০ বছরে একমাত্র পার্থক্য ছিলো পশ্চিমারা বাইবেলীয় কুসংস্কারকে ছুঁড়ে ফেলেছে এবং সমাজের সকল স্তরে সমঅধিকারকে ক্রমশ প্রতিষ্ঠা করেছে। আমরা উপসংহারে আসতে পারি, একজন বর্ণ-বৈষম্যহীন ম্লেচ্ছ মানসিকতা, একজন অতি 'দিব্য' বর্ণবাদী মানসিকতার চেয়ে হাজারগুনে মেধাবী।

যারা দাবী করে তাদের উচুজাতের 'উত্তম' মেধা আছে, তাদের প্রমাণ পেশ করা উচিত বিগত ৩০০ বছরে কি এমন মহান "গবেষণা" তাদের মেধাবীরা করেছে যে তাদের দাবীকে গুরুত্বের সাথে নিতে হবে?

রমন এবং চন্দ্রশেখরদের মত কিছু বিজ্ঞানীদের নাম দেওয়াটা আরো বোকামী, কারণ তারা যা কিছুই অর্জন করেছে তা অর্জন করতে পেরেছে যখন তারা ম্লেচ্ছদের পড়াশোনা গ্রহণ করেছে। তাদের জ্ঞান এসেছে ম্লে-চ্ছদের থেকে এবং ম্লেচ্ছরাই তাদের অবদানকে স্বীকার করেছে।

বিপরীতে, জন্মভিত্তিক বর্ণবাদী শিক্ষার কেন্দ্রগুলো, যেমন কাশী ইত্যা-দির উদাহরণ দেখুন। তারা তাদের শ্রেষ্ঠ জন্ম থেকে প্রাপ্য বিশেষায়িত জ্ঞান দিয়ে কি এমন বিরাট গবেষণাটা করেছেন? এক মহান বিজ্ঞানস-ম্মত ঐতিহ্য থেকে আলাদা হয়ে সস্তা চটকদার ও দক্ষিনার গল্পে অধঃ-পতিত হয়ে, এই মহান 'বিশ্ববিদ্যালয়' গুলোর অবদান খুবই সামান্য হয়ে গেছে।

এবং অপর দিকে একজন বর্ণবাদ মুক্ত ম্লেচ্ছ যোদ্ধা একজন অধিকতর শক্তিশালী ও সাহসী জন্মভিত্তিক বর্ণবাদী ক্ষত্রিয়ের চাইতেও অধিকতর কার্যকর। একারনেই, সাহসী রাজপুত থাকা সত্বেও আমাদেরকে এমনকি দাসদেরও দাসেরা শতাব্দির পর শতাব্দি দাস করে রেখেছিলো! (দাস রা-জবংশের ইতিহাস পড়ুন!) নায়কোচিত বিক্রম থাকা সত্ত্বেও আমরা আমাদের মেয়েদেরকে আকবরের মত মানসিক রোগীর সাথে বিয়ে দি-

য়েছিলাম! বৈদিক পণ্ডিতদের শক্তি এবং সাহসী দিব্য প্রদত্ত যোদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের কাশী বিশ্বনাথ গর্তে আশ্রয় নিচ্ছিলো! এবং গজনী সোমনাথ মন্দিরের উঠানে নারীদের ধর্ষন করেছিলো, ধন্য আমাদের জন্ম-ভিত্তিক বর্ণ ব্যবস্থা, এ ব্যবস্থা স্রেফ বিশেষ পরিবারসমূহকে যুদ্ধে প্রস্তুত করে তুলতে অনুমতি দেয় এবং তারপর হিন্দু ধর্মাবলম্বী থাকে শুধু-মাত্র যদি তারা ম্লেচ্ছদের দ্বারা স্পর্শ না হয়!

এছাড়াও, কম জ্ঞানী ইংরেজগণ শুধুমাত্র আমাদেরকেই শাসন করেনি অধিকন্তু অর্ধেক বিশ্বকে শাসন করেছে, কারন তারা তাদের নিজেদের সমাজ থেকে কৃত্তিম বৈষম্যকে বাতিল করেছিলো!

কিন্তু, হ্যা ভারত বহু বছর ধরে দাস এবং শূদ্রদ্রের উৎকৃষ্ট উৎপানকারী। কিছু বিদ্রোহীকে বাদ দিলে, আমাদের ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য থাকার লম্বা লম্বা দাবী থাকা সত্ত্বেও, সমাজ হিসেবে আমরা আমাদের শাসক-দের জুতা চেটেছি; যারাই আমাদের নিয়ন্ত্রন করতে এসেছিলো। আমাদের মালিকদের সেবা করতে আমরা গর্ব অনুভব করি। মুঘল সেনাবাহিনী ছিলো রাজপুত যোদ্ধা ও সেনাপতিদের প্রভাবাধীন। কিন্তু যখন হলদি ঘাটি যুদ্ধ সংগঠিত হলো, এই রাজপুতরাই সাহসী রানা প্রতাপকে পরাজিত করার চেষ্টা করছিলো! শিবাজী বেশিরভাগ যুদ্ধ সুলতানদের পা চাটা এই তথাক-থিত রাজপুত ও মারাঠাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন!

যারা নিজেদের উচ্চবর্ণ দাবী করে এবং জন্ম ভিত্তিক বর্ণ ব্যবস্থাকে অনু-শীলনের মাধ্যমে সমর্থন করে তারা তাদের কর্মের জন্য শূদ্র বা দাসদের চেয়ে উত্তম কেউ না! সন্দেহ নেই, তাদের ভ্রান্ত উচ্চবর্ণ সমর্থন করার জন্য এ সকল কারন ছিলো!

পাঠ ৬: জন্মভিত্তিক বর্ণবাদীরা হিন্দুধর্মের পতনের কারন

আমাদের এক সাংঘাতিক ভুল ছিল যে আমরা জোর করে ধর্মান্তরিত করা লোকদের হিন্দুধর্মে ফিরে আসার দরজা নিজেরা বন্ধ করে দিয়ে-ছিলাম। এবং এটাই দাসত্ব ও এর পরিনামে ভারতের ভাগ হওয়ার জন্য দায়ী। এমনকি আজও, হিন্দুধর্মই একমাত্র ধর্ম, যেখানে জন্মগ্রহণ ছাড়া লোকেদের এই ধর্মে গ্রহণ করে নেওয়ার কোনো পদ্ধতি নেই। অবশ্যই,

যদি আপনি বারানসিতে কিছু মার্কিন ডলার পরিশোধ করেন, তারা আপনাকে ধর্মান্তরিত করবে এবং হিন্দু আচার বিধি অনুসারে আপনাকে বিয়ে করিয়ে দেবে যাতে আপনি কিছু ছবি নিতে পারেন। এমনকি এই প্র-ক্রিয়াও শুরু হয়েছে আর্য সমাজের শুদ্ধি আন্দোলনের পর থেকে, যেটা গত শতাব্দীতে (১৯ শতকে) কিছু মেকী ব্রাহ্মণদের শক্ত বিরোধীতার সম্মু-খীন হয়েছিলো। আমাদের সংজ্ঞায় এই ধরনের লোকেরা শূদ্রেরও অধম।

অনেক তথাকথিত মেকী ব্রাহ্মণরা (এরা মেকী কারন তারা তাদের বংশগত ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে কোনো DNA তথ্য দিতে পারেনা) দাবী করে, অহিন্দুদের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা মানা যেতে পারে কিন্তু তাদেরকে শূদ্র হিসেবে হিন্দু ধর্মে আসতে হবে, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হিসেবে না! কি সুন্দর আত্মকেন্দ্রিক ক্ষমতার রাজনীতির নির্বুদ্ধিতা!! একজন স্টিফেন ক্ল্যাপ, যিনি হিন্দুধর্মের জন্য কাশীর সকল পণ্ডিতদের একত্রিত অবদান থেকেও বেশি অবদান রেখেছেন, তাকে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি স্রেফ তিনি জন্মগত ব্রাহ্মণ না হওয়ার কারনে! তাকে এই জন্মে অনুশোচনা করতে হবে এবং পরবর্তীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নিতে হবে এই অধিকার পেতে!

আমাদের ভাগ্যকে ধ্বংস করতে আমাদের কি কোনো বহিঃশত্রুর দরকার আছে?

আমরা বহু বছর ধরে এই নির্বুদ্ধিতার অনুশীলন করছি এবং এখনো তা বুঝতে পারছি না। আমি মুসলিম হতে চেয়ে একটি মসজিদে যেতে পারি। তারা তখনি সকল ব্যবস্থা করবে এবং আমাকে তাড়াতাড়ি মুসলিম করে নেবে। গীর্জা তো উল্টো মার্কিন ডলার দেবে আমাকে খ্রিস্টান করে নিতে। কিন্তু কেউ যদি মন্দিরে যায় তাদের পূর্বপুরুষের সংস্কৃতিকে (পুনরায়) গ্রহণ করতে, প্রথমেই পুজারী তার দিকে এমন দৃষ্টি দেবে যেন সে কোনো উৎকট কৌতুক শুনেছে। তারপর সে কিছু পণ্ডিতদের ডাকবে। অনেক ক্ষেত্রে মন্দিরের অবস্থানের উপর নির্ভর করে, এমনকি তার প্রবেশও হয়তো নিষিদ্ধ হয়ে থাকতে পারে। উধাহরণস্বরূপ, শুধুমাত্র ব্রাহ্মণরাই কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে! তারপর তাকে একটি প্রায়শ্চিত্তের তালিকা ধরিয়ে দেয়া হবে যাতে সে শূদ্র হতে পারে। শ্রদ্ধেয়

সাধু মহারাজের পছন্দের সুপারিশকৃত প্রায়শ্চিত্তের তালিকায় অর্ন্তভুক্ত আছে কয়েকদিনের জন্য গোবর ভক্ষন করা! ইসকনের মত অন্যান্য ধর্মীয় উপসম্প্রদায় এই বিষয়গুলোকে সহজ করেছে কারন তারা হিন্দুদের অল্প কয়েকটি উপসম্প্রদায়ের মধ্যে একটি, যারা আমাদের হারানো ভাইদের ফিরিয়ে আনার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে।

কিন্তু তখন তাদেরকে অন্য হিন্দু ধর্মীয় উপসম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতারক বলে। তখন পর্যন্ত তারা কাঞ্চিপুরম বা বিশ্বনাথ বা জগন্নাথ বা দ্বারকা কোনো মন্দিরেই প্রবেশ করতে পারে না। তারা তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিয়ে করতে পারে না। তারা বেদ পড়তে ও শিক্ষা দিতে পারে না। আমরা সকলেই নিরাপদ অবস্থানে থাকতে চেষ্টা করি, এবং পরামর্শ দেই শুধুমাত্র গীতা, ভাগবৎ পুরাণ ইত্যাদি পড়ো।

একমাত্র আর্যসমাজ ছাড়া আর কেউ নেই যারা মাওলানা থেকে বেদ শিক্ষক পণ্ডিত তৈরী করার সাহস দেখায়। তারা বিগত ১২৫ বছর ধরে তাদের ভিন্নতা বজায় রেখেছে। কিন্তু এই আর্যসমাজও বর্ণপ্রথাকে ধ্বংস করার তাদের মূল দায়িত্ব অবহেলা করছে! তারা পালিয়ে যাওয়া দম্পতিদের বিয়ে পরিচালনা করতে ও দক্ষিনা উপার্জনে ব্যাস্ত।

কোনো মুসলিম বা খ্রিস্টান কি তাদের মর্যাদার মূল্য দিয়ে (সম্মান নষ্ট করে) হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার মত বোকা হবে?

আমি কেবল মানসিকতাকে দোষারোপ করছি, কোনো ব্যাক্তিকে দোষ দিচ্ছি না। এই নির্বোধ জন্মভিত্তিক বর্ণব্যবস্থা ও মানসিকতাই আজকের সকল সমস্যার মূল কারন। আমরা যদি অতীতে দাস হয়ে থাকি, এই বর্ণব্যবস্থাই ছিলো এর কারন। আমরা যদি অতীতে ধর্ষিত ও খুন হয়ে থাকি, এই জন্মভিত্তিক বর্ণব্যবস্থাই ছিলো এর কারন। আমরা যদি বর্তমানে সন্ত্রাসের মুখোমুখি হয়ে থাকি, এই বর্ণব্যবস্থাই হলো এর কারন। অথচ এখন পর্যন্ত এটা বর্জন করতে আমরা রাজী না। আমরা জানি এর কোনো ভিত্তি নেই, কোনো বুনিয়াদ নেই, এটাকে যাচাই করার কোনো উপায় নেই। অথচ আমরা এখনো শত শত বছর ধরে আমাদের আত্মীয়দের হত্যাকারী এই সাপটিকে দুধ কলা দিয়ে পুষছি।

পাঠ ৭: জন্মভিত্তিক বর্ণবাদীরা ভারত ভাগের জন্য দায়ী

অনেক ভারতীয় দেশভাগকে জানে এবং কট্টরপন্থী মুসলিমদেরকে জানে। কিন্তু খুব কম লোকেই জানে, জিন্নাহ্ র দাদু হিন্দু ছিলেন। তিনি সামান্য কারনে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইকবাল (পাকিস্তানের জাতিয় কবি) ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে এসেছেন। এই পরিবারের ব্রাহ্মণত্ব এমনকি দুই প্রজন্মেরও পুরোনো নয়! আমাদের নির্বোধ বর্ণব্যবস্থা কাউকে ম্লেচ্ছ বানায় যদি সে কোনো ম্লেচ্ছের সাথে খাবারও খায়, আর তারপর সে আর ফিরে আসতে পারে না।

পরবর্তীতে যখন কিংবদন্তী স্বামী দয়ানন্দ ও শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করেন এবং সাভারকারের মত স্বপ্নদ্রষ্টাদের সমর্থন লাভ করেন তখন ধর্মের সুযোগসন্ধানী দালালরা নরম হলো কিন্তু নিম্নবর্ণ হিসেবে অত্যন্ত অবাস্তব হিন্দুধর্মে প্রবেশের অনুমোদন দিলো।

আজকের দিনে এই উপমহাদেশের সম্পূর্ণ মুসলিম ও খ্রিস্টান জন-গোষ্ঠী হলো আমাদের (জন্মভিত্তিক) বর্ণব্যবস্থার অপরাধের একমাত্র ফলাফল, এই ব্যবস্থা যে কাউকে তুচ্ছ কারনে বর্ণচ্যুত করে। অন্য ধর্ম ও তাদের বিশ্বাসকে নিন্দা করার আগে, আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত, "আমরা কোন মুখে তাদেরকে সম্মানের সাথে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব দেব?" "আমরা কোন অধিকারে তাদেরকে নিন্দা করব, যেখানে আমরা আমাদের নিজেদের যুক্তিহীন জাল গ্রন্থগুলোর পক্ষাবলম্বন করি, যেগুলো (জন্মভিত্তিক) বর্ণ ব্যবস্থা ও লিঙ্গ বৈষম্যকে সমর্থন করে?"

উপসংহারঃ

বর্ণবাদীদের উচিত আগে তাদের নিজেদের দোষগুলোর দিকে দেখা। আসুন, আমরা আমাদের প্রতি সৎ হই। অগ্নিবীর ইসলাম, কুরান বা বা-ইবেলের ইতিহাসের সমালোচনামূলক বিশ্লেষন করে, অগ্নিবীর এটা করে থাকে একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে, ঘৃনা থেকে নয়। অগ্নিবীর লোকেদের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না, সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মতবাদের উপর। একই-ভাবে, সে এটা বলার সাহস রাখে, যে সকল নিরর্থক গ্রন্থ বর্ণপ্রথা ও লিঙ্গ বৈষম্যের মত মর্যাদাহানিকর কলঙ্ককে সমর্থন করবে, সেগুলোকে সে

ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে এবং সেগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এ ধরনের গ্রন্থ, আচার অনুষ্ঠান, বা প্রার্থনা পদ্ধতির উপর আমরা কতটা অনুভুতি-প্রবন, অগ্নিবীর বিষয়টাকে পাত্তা দেয় না। অগ্নিবীর রক্তচোষা উকুন থেকে আমাদের মুক্তি দিতে দাঁড়িয়ে আছে।

এখনো আমরা সততার সাথে এগিয়ে আসতে পারি, নতুবা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের উপর যেকোনো বিতর্ক হবে আমাদের নিজেদের জঘন্য অপ-রাধের উপর লজ্জাহীনতার ঘোমটা টানা।

জাতপ্রথা নিপাত যাক

এবং তথাকথিত নিচুজাতের লোকেদের জন্য, পুনরায় উচুজাত হওয়ার কখনোই কোনো পদ্ধতি ছিলো না। আমরা বলেছিলাম, "মেধা নিপাত যাক।" নিয়তি বলেছিলো, "হিন্দুরা নিপাত যাক"!

অগ্নিবীর সকলের প্রতি আহবান জানায় বলুন, "তারা নিপাত যাক, যারা বলে, মেধা নিপাত যাক।"

অধ্যায় ৩

কিভাবে জাতব্যবস্থা ধ্বংস করা যায়

এই বই লেখার উদ্দেশ্য আশাহীন, ঘোলাটে চিত্র অঙ্কন করা নয় এবং সকলকে অপরাধ বোধে ভাবিত করা নয়। তার পরিবর্তে এই বইয়ের উদ্দে-শ্য হলো আমাদের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ হওয়া, এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি বুদ্ধিযুক্ত পথ প্রস্তুত করা।

ভারত ও হিন্দুদেরকে বাঁচাতে এটাই করতে হবে। আসুন আমরা এর জন্য যেভাবে পারি সংগ্রাম করি এবং শীঘ্রই এই প্রচেষ্ঠা কয়েক বছরের মধ্যে গুনিতক হারে বৃদ্ধি পাবে। আসুন আমরা চিন্তা, বাক্য ও কর্মে বর্ণপ্রথাকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করি।

কলঙ্কিত ইতিহাসকে ফিরিয়ে আনবেন না

আমাদের পূর্বপুরুষদের সহায়তা করা বন্ধ করুন, তাদের ভুলের পক্ষাব-লম্বন করবেন না। এটাও জাতপ্রথার একটা ধরন। যাকিছু ঘটেছে তার জন্য সমষ্টিগতভাবে দায়িত্ব নিন। তথাকথিত জন্মভিত্তিক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রাই একমাত্র দোষী না। তথাকথিত দলিত ও শূদ্ররাও সমান দোষী। কেন তারা এই মেকী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের ক্ষমতা কুক্ষিগত করা এবং শত শত বছর

ধরে তাদের উপদ্রব করা মেনে নিয়েছে?

অতীতে যা হবার তা হয়ে গেছে। নিজেকে মানুষ ছাড়া আর কোনো গোত্র জাতি পরিচয়ে ডাকা বন্ধ করুন। অতীতে যা ঘটে গেছে, বর্তমানে যা ঘটছে তার জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রদের দোষারোপ করা বন্ধ করুন। মনে রাখবেন আমাদের সংগ্রাম মানসিকতার বিরুদ্ধে, কোনো ব্যাক্তি মানুষের বিরুদ্ধে নয়। আমাদের সফলতা নির্ভর করে, আমরা কোনো ব্যাক্তিকে প্রথমেই তার জাতের দ্বারা তাকে গ্রহণ করতে কতটা শক্তভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারি, তার উপর।

আমাদের বুঝতে হবে খুব কম লোকেই জাতপাত ব্যাবস্থা বিশ্বাস করে এবং এটাকে প্রচার করে। অল্প কিছু লোকের জন্য সকল জন্মভিত্তিক ব্রাহ্মণদের দোষারোপ করাটা বোকামী। আমাদের অবশ্যই সত্যটা স্বীকার করে নিতে হবে, স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী, যিনি বেদের ভিত্তিতে জাতপ্রথার মিথকে (রূপকথাকে) ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন। যে ব্যাক্তি আম্বেদকরকে তার নাম ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন, তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন। (আম্বেদকর একটি ব্রাহ্মণ পদবী, এটি ভীমরাওয়ের পারিবারিক পদবী নয়)। বীর সাভারকার যিনি জাতব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংসের পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন।

একটি উচুজাত বনাম নিচুজাত ইস্যু তৈরীর পরিবর্তে, আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে এটা এমন একটা ইস্যু যেটা সমাজের সকল শ্রেণীর উপর প্রভাব ফেলবে, এবং অতঃপর অবশ্যই সমষ্টিগতভাবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নামে জাতপ্রথার পক্ষাবলম্বন করবেন না

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নামে সবকিছুর পক্ষাবলম্বন করার অভ্যাস বন্ধ করুন।

জন্মভিত্তিক জাতব্যবস্থাকে শক্তি জোগায় এমন প্রতিটা গ্রন্থ, প্রতিটা রীতিনীতি ও প্রতিটা প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করুন। আসুন আমরা এটাকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেই, এটা হোক প্রতিটা বড় মন্দিরে বা অনুষ্ঠানে

বা প্রতিটা গ্রন্থে, যেগুলো বংশপরম্পরাক্রমে একদম ছোটোকাল থেকে আমাদেরকে ভালোবাসতে শিখানো হয়েছে।

অগ্নিবীর এ ধরনের হাস্যকর যাচাই অযোগ্য অনুমানের কোনো সমর্থন প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদে পায়নি। বরং বেদ যোগ্যতা ও গুনতন্ত্রকে প্রশংসা করে। এছাড়াও, আমাদের জানামতে বেদ সকল প্রকার প্রক্ষিপ্ততা থেকে মুক্ত। সুতরাং, আমরা বেদকে আমাদের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করি। অন্য সকল গ্রন্থ শুধুমাত্র বর্ধিতাংশ হিসেবে গ্রহনযোগ্য হবে যদি সেগুলো বেদ অনুসারী হয়। এবং যদি এগুলো জাতিভেদ, বর্ণবাদ বা লিঙ্গ বৈষম্যের সমর্থক হয়, সেগুলো ধর্মগ্রন্থ নয়। আসুন আমরা এগুলোকে সরাসরি বর্জন করি, সেই সাথে ঐ সকল লোক, প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানগুলোকে বর্জন করি যারা এসবের পক্ষাবলম্বন করে।

এর মানে এই না, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পূর্ণরূপে বাতিল করছি। তাদের ভালো দিকগুলোকে গ্রহণ করুন; যদি আপনি চান আপনার পূর্বপুরুষের কর্মসমূহের পথচিহ্নকে রাখুন, কিন্তু শুধুমাত্র অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে রাখুন। আপনার পূর্বপুরুষদের কর্মের উপর ভিত্তি করে আপনার শ্রেষ্ঠত্বের মোহ উপভোগ করাকে বর্জন করুন। আপনার পূর্বপুরুষ প্রথম স্থানাধিকারী ছিলেন এ জন্য কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাকে ১ম স্থান দেবে না!

যে সকল মন্দির দলিত প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করে, সে সব মন্দিরকে স্বীকার করবেন না

এমন কোনো মন্দিরকে স্বীকার করবেন না, যারা মেধাবী তথাকথিত দলিতদের পুজারী হিসেবে গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। হয় এর নিয়ন্ত্রন গ্রহণ করে এখানে যোগ্যতাতন্ত্র (জন্মভিত্তিক নয় যোগ্যতাভিত্তিক) স্থাপন করুন অথবা এ ধরনের ঘৃনার মন্দিরকে বয়কট করুন। এ মন্দির হয়তো বিখ্যাত তীর্থকেন্দ্র হতে পারে, কিন্তু প্রচার একজন দূর্জনকে নায়ক বানায় না।

অহিন্দুদেরকে হিন্দু হিসেবে গ্রহণ করুন

যুক্তিপূর্ণ মানসিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্থানীয় মন্দিরগুলোকে সহায়তা

করুন, খোলাখুলিভাবে অহিন্দুদের সন্মানের সাথে হিন্দু হিসেবে গ্রহণ করতে। তারা হয়তো কাউকে হিন্দু হিসেবে গ্রহণ করতে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চা-রনের মত ছোটো খাটো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করতে পারে। (হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে) সে একজন মানুষ এটি ছাড়া আর কোনো বর্ণ উচ্চারন করার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট মৌলিক জীবনধারা নিয়ম যেমন খাদ্য, দান, শিক্ষা, অহিংসা, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা, সকল মানবের প্রতি সমদর্শন ইত্যাদি অনুসরন করাই যথেষ্ট।

শুদ্ধি অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন

যেখানে বিপুল সংখ্যায় শুদ্ধিযজ্ঞ করা হয় সেখানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা উচিত। এবং সেখানে যারা অংশ গ্রহণ করেছে তাদের মধ্য থেকে ব্রাহ্মণ তৈরী করতে হবে, তারা তখন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পরিচালনা করার এবং মন্দিরের পুজারী হওয়ার উপযুক্ত হবে।

বাস্তবে, দলিত ও পূর্বে অহিন্দু ছিলো (এখন হিন্দু) এমন পুজারীদের-কে দিয়ে বিশেষ মন্দির খোলা উচিত। এটা অনেক স্থানে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে, কিন্তু আরো আগ্রাসীভাবে করতে হবে।

তথাকথিত দলিত এলাকাগুলোতে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করে তাদেরকে ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত করতে হবে, তারা তখন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করে অন্য দলিতদের ব্রাহ্মণ করে নেবে। তারও পরে, এই লোকেদের শর্মা, তিওয়ারী, ত্রিপাঠী, চতুর্বেদী, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী ইত্যাদি পদবী দিতে হবে, যা তারা বৈধভাবে ব্যবহার করতে পারবে। এইটি কয়েক বছরের মধ্যে ব্যাপকহারে করতে হবে, এতে করে কয়েক বছরের মধ্যে এবং পরবর্তীতে কয়েক প্রজন্মের মধ্যে ব্রাহ্মণদের সাথে এদের পার্থক্য করা অসম্ভব হয়ে যাবে। (কয়েক প্রজন্ম পরে বিশ্বাসযোগ্য DNA পরীক্ষার অনুপস্থিতিতে ব্রাহ্মণদের খুঁজে পাওয়ার আর কোনো উপায় থাকবে না). স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী বৈদিক ধর্মকে সমৃদ্ধ করতে উপবীত দান করতেন। আমাদের মিশনকে বিস্তার করতে আমাদেরও এই প্রতীককে ব্যবহার করা উচিত।

এ কাজে কি চ্যালেঞ্জ আসবে?

একটি চ্যালেঞ্জ আসতে পারে, আর তা আসতে পারে কোটা সংরক্ষন ভিত্তিক রাজনীতির দিক থেকে, যারা তথাকথিত দলিতদের 'দলিত' ডেকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে রাখে এবং সম্মানের মূল্যের বিনিময়ে সুবিধা অর্জন করে। কিন্তু যদি অধিক হারে মানব গোষ্ঠী এই (শুদ্ধি) অনুষ্ঠানকে সমর্থন করে এবং সংগঠকদের লক্ষ্য পথ অনুসন্ধান করে, এই বিষয়টির ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটবে। যাই হোক না কেন, দুই দশকের মধ্যেই সমাজের শিক্ষিত অংশে অধিকতর শিল্পউদ্যোক্তার আকর্ষন ও বিশ্বব্যাপী সুযোগের কারনে নিরাপদ সরকারী চাকুরীর নেশা কমে যাবে, প্রযুক্তির বিপ্লবকে ধন্যবাদ।

এখন রাজনীতিকীকরনের কারনে, লোকেরা দলিত বা অনার্য্য হিসেবে গর্ববোধ করছে! এটা অত্যন্ত বোকা বোকা প্রতিক্রিয়া, এটা উদ্দেশ্যটা-কেই পরাজিত করে। দলিত কথার অর্থ হলো যে অত্যাচারিত। এটা একটা অপব্যবহার এবং সমাজের উচিত যেকোনো জাতবর্ণের জন্য এই শব্দ-টিকে বর্জন করা। যে কেউ অর্থনৈতিকভাবে বা সামাজিকভাবে অবহে-লিত সে ই তার জাতপাত গোত্র নির্বিশেষে দলিত। যেকোন দূর্জন ব্যাক্তিই অনার্য্য। একজন জেলের মেয়েও ব্রাহ্মণ যদি তিনি পণ্ডিত হয়ে থাকেন। তিনিই চতুর্বেদী যিনি চার বেদের উপর দক্ষ। জনগোষ্ঠীকে দলিত, আর্য, পিছিয়ে পড়া জাতি, পিছিয়ে পড়া জাতি, তফসিলী জাতি এসব পরিভা-ষায় লালন পালন করার পরিবর্তে আমাদের উচিত এই ধরনের বুদ্ধিহীন বিভেদগুলোকে বর্জন করা, যেহেতু পুরো মানবগোষ্ঠীই এক জাতি এক গোষ্ঠী। বিরোধপূর্ণ দলগুলো বহুজন, দলিত, দ্রাবিড় তোষন করছে, এরা মানবতার বড় শত্রু পূর্বের মেকী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মত। এরা উভয়েই হাস্যকর জাতপ্রথাকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য বা নিছক অযৌক্তিক কারনে।

কিন্তু ফাঁপা জাতপ্রথার ভ্রান্তিতা বুঝার এবং এর ভিত্তিকে ধ্বংস করার এখনই সঠিক সময়। অবশ্যই এতে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, কিন্তু এর সুযোগটা ঐতিহাসিক।

অগ্নিবীরের সমাধান

অগ্নিবীর এটিকে অগ্রাধিকার দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ৷ আমরা সকলকে আহবান জানাই আমাদের সাথে এই মিশনে যোগ দিন, উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলো তৃনমূল স্তরে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা একটি আন্দোলন প্রবর্তন করেছি৷

আমরা জানি, এই অধ্যায়টি হয়তো কিছু লোকেদের থেকে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, যারা জন্মভিত্তিতে বেদের অস্বীকৃতিকে সমর্থন করে বা মনে করে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা অন্যান্য মেকী ধারনাকে সমর্থন করে৷ কিন্তু আমরা এসবকে পাত্তা দেই না কার আমরা সত্যের সাথে আছি এবং জানি যে, জাতপ্রথা বেদের বিরোধী, মানবতার বিরোধী, যুক্তি বিরোধী এবং জাতি বিরোধী৷

যারা এই বিষয়ের উপর আমাদের সাথে বিতর্ক করতে চান, তাদেরকে স্বাগতম! কিন্তু তার আগে আপনাকে অবশ্যই আপনার DNA প্রতিবেদন দেখাতে হবে, যাতে আমরা নির্ভরযোগ্যভাবে উপসংহারে আসতে পারি যে, আপনি অবশ্যই বেদের প্রারম্ভের সময় থেকে ব্রাহ্মণ বংশ থেকে এসেছেন, আর আপনি ধূর্ত চণ্ডালের সন্তান না, যারা কয়েক প্রজন্ম আগে থেকে ব্রাহ্মণের ভেক ধরেছে!! কারন সবকিছুর উপর আপনার নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী একমাত্র প্রকৃত ব্রাহ্মণেরই বেদের উপর বিতর্ক করার অধিকার আছে!

যোগ্যতার শাসন জয়ী হোক!

অধ্যায় ৪

ব্রাহ্মণ শূদ্র আমি গুরুত্ব দেই না

যদি আমাকে মানব মস্তিষ্কের সবচেয়ে মূর্খতাপূর্ণ রীতির উদ্ভাবনকে চিহ্নিত করতে বলা হয়, (আমি বলব) এটা হবে জাতপ্রথা।

আমাকে ভুলভাবে নিবেন না। আমি জাতপ্রথাকে সবচেয়ে মন্দ হিসেবে সূচিত করছি না। আমি দাসত্ব, এক জাতির অন্য জাতির উপর প্রভুত্ব, কাউকে কাফির ভাবা এগুলো আরো জঘন্য। কাউকে তার গায়ের রং কালো বলে, তাকে সম্পদ হিসেবে দাস বানানো এটা বর্বরতার লক্ষন। এগুলো 'মানুষ' শব্দেরও যোগ্যতা রাখে না।

একইভাবে, যে লোকেরা আমার গ্রন্থ, আমার ধারনা বা আমার নবীকে মানবে না তারা কাফির বা নিকৃষ্টতম জীব বা নরকে যাবে, এসব বিশ্বাস করা এটাও বর্বর উপজাতীয় গোষ্ঠীভিত্তিক মানসিকতা। এটা বিকশিত চিন্তাকে উপস্থাপন করে না। ১৮৬৫ এর পূর্বে USA যা করেছিলো বা আল কায়েদা ও তালেবানী মানসিকতা বর্তমানে যা করছে, এগুলোও "বিকশিত মানব চিন্তা" এর আওতায় আসে না। এগুলো প্রাণীদের আচরন।

যদি আমি নিজে আরো অধিকতর "পরিমার্জিত" নব ধারনার সেটগুলো-কে সাজাই, জাতপ্রথা অন্যগুলোর চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকবে। **জা-**

তপ্রথা গানিতিকভাবে ক্রুটিপূর্ন, যাচাই অযোগ্য এবং কুসংস্কার ধারনা, এর কোনো যুক্তিপূর্ণ ভিত্তি নেই, এটি একই সাথে হিন্দু ধর্মের মূল উৎস বেদের বিরুদ্ধ। এখন পর্যন্ত, এই বুদ্ধিহীন আবিষ্কার এই মহান দেশের অন্যান্য ঐশ্বর্যশালী সংস্কৃতির সবচেয়ে ক্ষতি সাধন করেছে। একটা নেকড়ের মত সরাসরি আক্রমন করার বদলে এটা রক্ত-চোষা বাদুরের মত ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের রক্ত চুষে নিয়েছে।

আমি ইতিমধ্যেই বিস্তৃতভাবে লিখেছি কিভাবে এই বোকামীপূর্ণ রীতি হিন্দু ধর্মের মূল উৎস বেদের মতবাদের বিরোধী। আমি আরো আলোচনা করেছি আমরা সমাজ ও দেশ হিসেবে যে দাসত্ব ও নির্মমতার মুখোমুখি হয়েছি, কিভাবে এটি তার জন্য প্রধানত দায়ী। এবং কিভাবে এই জাতপ্রথা আমাদের সভ্যতার উজ্জ্বল মুখে একটি বিরাট কলঙ্কচিহ্ন।

এটির শেষ অধ্যায়ে, আমরা জাতপ্রথার মৌলিক বাক্যের কিছু অর্ন্তনিহীত ক্রুটিগুলোকে দেখব।

ক্রুটি ১: জাতপ্রথা প্রত্যেকটা মানুষকে আলাদা করে

জাতপ্রথা দরকারীভাবে প্রত্যেকটা মানুষকে চারটি কোঠার যেকোন একটিতে আলাদা করে। এই কোঠাগুলো হলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এক কথায় এটা বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্রের মত।

এই চারটি অপ্রাসঙ্গিক পছন্দের বাইরে এতে আর অন্য কোনো অপশন নেই। এছাড়া, যদি তুমি এ ধরনের কিছু করার সাহস কর তাহলে জাতিচ্যুত হওয়ার শাস্তি আছে। সুতরাং, সিদ্ধান্ত গ্রহীতার খেয়াল খুশিমত একটি যু-ক্তিহীন উত্তর পছন্দ করা হয়।

বাস্তবে, চার জাতকে বেদে বর্ণ (যার অর্থ পছন্দ) বলা হয়েছে। এগুলো মানব আচরণ ব্যাখ্যা করার মডেলের একটি অংশ যাতে করে সমাজের গঠনের জন্য বিচক্ষন পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যায়। সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার একটা নির্দিষ্ট মডেল হতে শুরু হয়, যেগুলোকে আরো বিশ্লেষন করা হয়, বৃদ্ধি করা হয় এবং এর থেকে প্রয়োজনীয় ফলাফল বের করতে ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভর, ওজন, গতি ও ত্বরণের ধারনাগুলো হলো জটিল বলবিদ্যার ভিত্তি এবং এগুলো সুবিধা আহরন

করে। বেদ এ ধরনের নকশার উপাদানগুলোকে সুপারিশ করে এবং বর্ণ ব্যবস্থা হলো এধরনের অনেকগুলোর মধ্যে একটি। বাস্তবতাঃ

বেদ অনুসারে, এই চার বর্ণ যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে বর্ণনা করে। বিভিন্ন মানব আচরন এই মৌলিক বৈশি-ষ্ট্যগুলোর বিভিন্ন মিশ্রনে ব্যাখ্যা করা যায়। একই ব্যাক্তিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পয়েন্টে এই বৈশিষ্ট্যগুলো ভিন্ন হয়, সেই সাথে পছন্দসই অনুসন্ধা-নের ক্ষেত্র অনুসারেও এটি ভিন্ন হয়।

এই ধারনাটি CMYK মডেলের অনুরূপ, এই CMYK মডেল ছাপানোর কাজে বিভিন্ন রং ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহৃত হয়। সবুজে নীল, ম্যাজেন্টা, হলুদ ও কালো রংগুলো কাগজের উপর প্রত্যেকটা অংশে নিরূপন করে সকল ধরনের ছবি তৈরী করে, যেগুলো আমরা ম্যাগাজিন ও ফটোগ্রাফে দেখতে পাই। ভেবে দেখুন আপনি আমাকে কতটা বোকা মনে করবেন যদি আমি আপনাকে কিছু লোকের ছবি দেখাই, এবং আপনার নিকট এই উত্তর দাবী করি যে, ছবিটা সবুজে নীল, ম্যাজেন্টা, হলুদ বা কালোর মধ্যে কোনটা! যদি আমি এমনটা আমার এলাকার প্রত্যেকের সাথে করি, সম্ভ-বতঃ তারা একত্রে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে যাতে আমাকে জনগনের স্বার্থে মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়! জাতপ্রথার ব্যাপারে, এই পাগলামিটা আমাদের কলোনীতে সহ্য করে যাওয়া হয়েছে বহু যুগ ধরে এবং এটি ব্যাপক ধ্বংস ডেকে এনেছে।

ক্রুটি ২: জাত ব্যবস্থা চার বর্ণে সীমিত করে দেয়া হয়েছে।

এক ধাপ আগে পূর্বের পয়েন্টে যান, কঠিন বাস্তবতা হলো জাত প্রথা কখনোই এই চার বর্ণে সীমাবদ্ধ ছিলো না। যেমনটা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, চার জাতি মডেলের বাইরে এবং এই জাতি গোষ্ঠীর সংমিশ্রনের বিচক্ষন অপশনগুলো সম্পর্কে মুক্তভাবে চিন্তা করার সীমাবদ্ধতার কারনে, লো-কজনকে বাধ্য করা হয়েছে জাতি, উপজাতি, উপ-উপ-উপজাতি এক জটিল জাল তৈরী করতে। এমনকি ব্রাহ্মণদের মধ্যে উচ্চজাতের ব্রাহ্মণ ও নিম্ন জাতের ব্রাহ্মণও আছে। কেউ যদি বারাণসীতে বেদ শিক্ষার জন্য যায়, এবং যদি সে উচ্চজাতের ব্রাহ্মন পরিবার থেকে আসা ব্রাহ্মণ সন্তান না হয় তাহলে উচ্চজাতের ব্রাহ্মণরা বেদ শিক্ষা দিতে অস্বীকার করবে।

এমনকি তথাকথিত নিচু দলিত ও শূদ্রদের মধ্যেও, উচ্চ জাতের দলিত ও নিম্ন জাতের দলিত। একজন যাদব বিশনোই এর চেয়ে নিজেকে উঁচু দাবী করবে এবং বিশনোই নিজেকে যাদবের চেয়ে উঁচু দাবী করবে। যদিও প্রত্যেকে আবার OBC বা SC/ST তালিকায় নিজেদের অর্ন্তভুক্তির জন্য সংগ্রাম করবে। দশ্যা আগরওয়াল ও বিশ্যা আগরওয়াল আছে এবং তারা প্রত্যেকেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবী করে। প্রজাপতি আছেন, যিনি কখনো কখনো নিজেকে বৈশ্য ও কখনো বা শূদ্র দাবী করবেন। এমনকি মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যেও শত শত জাত, উপজাত, উচ্চজাত ও নিচুজাত আছে। বর্তমানে, আমাদের এ ধরনের হাজারো তুচ্ছ শ্রেণীবিভাগ আছে, এবং আমরা সকলে জন্মের মাধ্যমে আমাদের নিজেদের শ্রেণীর অর্ন্তভু-ক্ত হওয়া নিয়ে গর্বিত হই। আমরা আমাদের নিজেদের উপ-উপ-উপ....... উপজাতির বিশেষ অধিকার সংরক্ষনের জন্য আবার সংগ্রামও করি।

একটি বুদ্ধিহীন (জাতপ্রথার) ধারনা, এ ধরনের আরো অধিকতর বুদ্ধি-হীন জাতিজালের জটিল তন্ত্রের দিকে নিয়ে গেছে এবং এটা বাড়ছেই। এ কারনেই আমি এটিকে একটি বোকামী আবিষ্কার বলে উল্লেখ করি।

যদি আমরা ধর্মগ্রন্থগুলোর দিকে যাই, যেগুলোকে এই বিশৃঙ্খলা শুরু করার জন্য দায়ী করা হয়, সেখানে এ ধরনের জটিল শ্রেণীবিভাগের কোনো দূরবর্তী রেফারেন্সও দেয়া নেই। এবং এ কারনে, নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ আবিষ্কার এই হাজারো উপ-উপ-উপ..... উপজাতির সামাজিক অধিকার ও অবস্থানের ব্যাপারে স্থায়ী বিশৃঙ্খলা আছে।

যদি আমরা যথেষ্ট বিনয়ীভাবে মূল উৎস বেদে ফিরে যাই, বেদ পরিষ্কার ঘোষনা করছে, একটিমাত্র জাতি আছে, তা হলো মনুষ্যজাতি। জন্ম নি-র্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার আছে। একজন মানুষ যা কিছু মর্যাদা অর্জন করে, সেটা একমাত্র তার যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে অর্জন করে অন্য কোনো কিছুর উপর না।

ক্রুটি ৩: জাতপ্রথা হিন্দু গ্রন্থগুলো সমর্থন করে

কিছু বিজ্ঞতম বোকা ধর্মগ্রন্থ থেকে রেফারেন্স দেয়, ব্রাহ্মণরা ঈশ্বরের মুখ থেকে এসেছে, ক্ষত্রিয় বাহু থেকে, বৈশ্য পেট থেকে আর শূদ্র পা থেকে

এসেছে। তাই, জাতপ্রথা জন্মভিত্তিক। আমরা ইতিমধ্যেই এই রেফারেন্স বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছি।

কিন্তু চলুন আমরা এখন মূল্যায়ন করি কিভাবে এই পুরো দৃষ্টিভঙ্গীটি কতটা ত্রুটিপূর্ন

ব্রাহ্মণদেরকে মুখ থেকে এবং শূদ্রদেরকে পা থেকে সৃষ্টি করে ঈশ্বরও কি একটি ছাড়পত্র দিচ্ছেন? বা, তিনি কি পাইরেসী রোধ করতে যাচাইকরনের জন্য কোনো ট্যাগ দিচ্ছেন? সর্বোচ্চ মৌলিক নথিপত্রে এই উপাদানগুলো আছে। ঈশ্বর এইটিকে ধরতে না পারার মত এত অল্পবুদ্ধি কেন হলেন?

যদি তিনি তা না হন, তাহলে কোন প্রক্রিয়ায় আমরা যাচাই করব, যে নিজেকে ব্রাহ্মণ দাবী করছে সে আসলে ব্রাহ্মণ কিনা? লক্ষ লক্ষ বছর আগে সভ্যতার শুরুতে ঈশ্বরের মুখ থেকে নির্গত হওয়া প্রথম ব্রাহ্মণের বংশধর সে, এ বিষয়ে তার কাছে কি কোনো DNA পরীক্ষার ছাড়পত্র আছে?

যদি না থাকে, তবে কেন আমরা এটা বিশ্বাস করব? অবশ্যই, এখানে একজন অসৎ লোকের নিজেকে ব্রাহ্মণ হিসেবে দাবী করার একটি স্বাভাবিক উৎসাহ দেয়া আছে। কারন ব্রাহ্মণ হলে আপনি বিশেষ কিছু অধিকার পাচ্ছেন। আমরা কি দেশের দূর্নীতির আখড়াগুলো হতে বেশকিছু সংখ্যক ভুয়া সার্টিফিকেট ও ভুয়া কারেন্সি নোট ছাপা হতে দেখি না?

কঠিন বাস্তবতা হলো, লক্ষ লক্ষ বছর বাদ দিন, আজকের একজন ব্রাহ্মণ ২০০ বছর আগের ব্রাহ্মণের বংশধর কিনা এটা যাচাই করারও কোনো সুযোগ নেই। বর্তমান সময়ে ID প্রমান এসেছে, এবং এটাও জাল করা হচ্ছে। আজকের একজন ব্রাহ্মণ সভ্যতার শুরুর দিকের ব্রাহ্মণের বংশধর হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। একইভাবে, আজকের একজন ‘দলিত’ সভ্যতার শুরুর দিকের দলিতের বংশধর হওয়ার সম্ভাবনা আরো কম।

একই তর্ক প্রতিটা জাতের জন্য একই।

সুতরাং, জাতপ্রথা দৈবিক কিছু না। যদি এটা দৈবিক হতো, অবশ্যই এটিকে

যাচাই করার জন্য তর্কাতীতভাবে কোনো না কোনো পথ থাকতো। উদাহরণস্বরূপ, মানব আর পশুকে খুব সহজেই আলাদা করা যায় (যেখানে মানুষ পশুর মত কাজ করেছে আমি ঐ ঘটনাগুলোকে বাদ দিচ্ছি)। কবুতর আর কুকুর যেমন সহজেই আলাদা করা যায় (আমি সেটার কথা বলছি)।

এটা বিষয় না, জাতপ্রথাটি একটি মানব আবিষ্কার। অতি আদিম বুদ্ধি সবকিছুকেই সাদা-কালো, ভালো-মন্দ এই রকম দুইভাগে চিন্তা করে। বিবর্ধিত বুদ্ধি এতে আরো অধিক বৈচিত্র রাখে। যাহোক, একটা উর্বর মস্তিষ্ক বাস্তবতাকে মেনে নেয়, এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া, এবং যেকোনো শ্রেণিবিভাগ স্রেফ একটা প্রায় সঠিক মান। চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে, তুমি জগৎকে ব্যাখ্যা করতে আরো জটিল মডেল ব্যবহার শুরু করবে।

ছোটোবেলায়, আমরা লাইন এঁকে ও তাকে গণনা করে যোগ বিয়োগ করতে শিখি। তারপর আমরা শিখি পাটীগনিত ও বীজগনিত। বুদ্ধিমান ছেলেরা ক্যলকুলাস বুঝেছে। বীজগনিত বর্গ ও আয়তাকার বুঝতে সাহায্য করে। কিন্তু গোলাকার বস্তুর আয়তন পেতে আমাদের ক্যলকুলাস শিখতে হয়। তাই, তোমার পুস্তক অনুসারে ঘনের সূত্র ঐশ্বরিক শুধু এই কারনে যদি আমরা গোলাকার বস্তুর আয়তন পেতে ঘনের সূত্র ব্যবহার করতে চেষ্টা করি, এটা হবে বুদ্ধিহীন গোঁড়ামী। আসুন আমরা আরো সৎ হই এবং স্বীকার করি বর্ণপ্রথা একটি ভিত্তিহীন, অযাচাইযোগ্য, অদ্ভুত আবিষ্কার। একজন ব্যাক্তির ব্যাপারে আমরা সকলেই বলতে পারি, সে (ছেলে বা মেয়ে) একজন ব্যাক্তি। তার জাতের উপর কোনো দাবী হবে একটি অন্ধ বিবৃতি।

ত্রুটি ৪: ম্লেচ্ছ কোনো জাতের অর্ন্তভুক্ত না

কেউ জানে না এই বিশ্বের ৬ বিলিয়ন অহিন্দু জনগনকে কোন জাতে রাখা হবে। যখন কোনো ব্যাক্তি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে, এই লোক ব্রাহ্মণ না শূদ্র হবে এই বিতর্ক নির্বুদ্ধিতার। স্টিফেন ক্ন্যাপের মত লোককে হিন্দু ঘরে জন্ম না নেওয়ায় পুরীর মন্দিরে ঢুকতে দেয়া হয়নি, অথচ তিনি অন্ধবিশ্বাসী জাতিবাদী পণ্ডিতদের চেয়েও হিন্দুধর্মের জন্য বেশি অবদান রেখেছেন।

কেউ কেউ তাদেরকে ম্লেচ্ছ বলে।

বাস্তবে, যদিও এই ম্লেচ্ছরা কাশীর সকল জাতিবাদী পণ্ডিতদের সম্মিলিত বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টির তুলনায় অধিকতর বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টি প্রদর্শন করেছেন। তারা অনেক গবেষণা, রীতি, উদ্ভাবন, আবিষ্কার করেছেন এবং এমনকি জাতিবাদীদের বইগুলোরও প্রয়োজন হয় এই জাতহীনদের আবিষ্কৃত ছাপা প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট ব্যবহার করার!

হয় এই ম্লেচ্ছরাই আসল ব্রাহ্মণ অথবা ঈশ্বর পুরো বিশ্ব ম্লেচ্ছ বা জাতিহীনদের উত্তম সৃষ্টি করেছেন।

ভারত দাসত্ব বরণ করেছিলো এই নির্বোধ জন্মভিত্তিক জাতপ্রথার কারনে, এই জাতপ্রথা তুচ্ছ কারনে কোনো ব্যাক্তিকে জাতিচ্যুতি নিশ্চিত করতো অথচ এধরনের লোকেদের পুনরায় সম্মানীত হিন্দু করে নেওয়ার কোনো কৌশল ছিলো না। ফলশ্রুতিতে, আমরা দেখি কাশ্মীর, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমাদের মাথাব্যাথার কারন হচ্ছে।

ক্রুটি ৫: শুধুমাত্র বিশেষ অবস্থায় জাত পরিবর্তিত হতে পারে।

কিছু আধুনিক চিন্তাবিদ দাবী করেন, জাতপাত কর্ম ও গুনের ভিত্তিতে হয়, জন্মের ভিত্তিতে হয় না। অন্যরা বলেন, বিশেষ অবস্থায়, যে কেউ জাত পরিবর্তন করতে পারে। এই উভয় যুক্তিই ক্রুটিপূর্ণ। কারণ তাদের উভয়েই একটি তৃতীয় পক্ষ ছাড়পত্র প্রদানকারীর অস্তিত্বের দাবী করে যারা জাতপাতের বন্টন করে। কিন্তু যেহেতু আধ্যাত্মিকতা সরাসরি আমার ও ঈশ্বরের সাথে, তাহলে কে এই তৃতীয় পক্ষ দালাল, যে ছাড়পত্র দেবে, আমি কিভাবে আমার ঈশ্বরের বাণী অনুসরণ করব? এবং কে এই ছাড়পত্রের দালালদের বর্ণ নির্ধারণ করবে।

অধিকন্তু, হয়তো পুরোনো সমাজে প্রতিটা সদস্যকে চারটির যেকোন একটি জাতবর্ণে সহজেই আলাদা করা যেত। কারন পেশা খুব সরল ছিলো। যাহোক, বর্তমানে জটিলতার কারনে এটা করা অসম্ভব। **চার অংশে শ্রেণীবদ্ধ করা অত্যন্ত ক্রুটিপূর্ণ ও সেকেলে।** উদাহরণস্বরূপ, একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের জাতবর্ণ কি হবে? একজন কম্পিউটার যন্ত্রবি-

দের জাতবর্ণ কি হবে? একজন এন্টি ভাইরাস প্রস্তুতকারী যিনি সাইবার আক্রমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন তার জাতবর্ণ কি হবে? একজন ই কমার্স ডেভেলপারের জাতবর্ণ কি হবে? একজন বেতনভুক্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপ-কের জাতবর্ণ কি হবে?

যে ব্যাক্তি গুরুত্বের সাথে গনিত পড়েনি শুধুমাত্র সে ই একটি আনুমানিক কাছাকাছি শ্রেণিবিভাগকে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করবে, এটা সে করবে এর কারন হলো, স্রেফ কোনো আত্মপক্ষসমর্থক কোনো অখ্যাত বইয়ে এমনটা লেখা আছে এটা তাকে বলেছে। একজন সৎ ব্যাক্তি শুধু বলবে, তারা সকলে মানুষ। এবং প্রতিটা মুহূর্তে, তারা ব্রাহ্মণ (জ্ঞান সম্বন্ধীয়), ক্ষত্রিয় (প্রতিরক্ষা সম্বন্ধীয়), বৈশ্য (অর্থনীতি সম্বন্ধীয়) বা শূদ্র (সেবা সম্ব-ন্ধীয়) হয়ে এক বা একাধিক ভুমিকা পালন করছে।

ক্রুটি ৬: জাত ব্যবস্থা হিন্দুধর্মের ভিত্তি

কেউ কেউ এটিকে এই বলে সমর্থন করতে পারেন যে, এইটি সনাতন ধর্মের ভিত্তি। তারা ইতিহাস ও পুরুষ সুক্তের রেফারেন্স টানতে পারে। ইতিহাসে ছিলো, এই যুক্তি ধোপে টিকে না। এমন অনেক কিছুই আমরা করি যা আমরা অতীতে কখনো করিনি। এবং এমন অনেক কিছুই আমরা অতীতে করেছি যেটা বর্তমানে আমরা নিজেরাই ক্ষতিকর হিসেবে সানন্দে ত্যাগ করেছি। উদাহরণস্বরূপ, বহুবিবাহ ও রাজার শাসন।

এছাড়াও আমরা ভুলে গেছি, বেদ শত শত মডেল বা কাঠামো আমাদের দেয়, এবং যদি আমরা কোনো কাঠামোকে যথাযথভাবে বুঝতে না পারি আমাদের জন্য ভালো হয় অন্য মডেল বা কাঠামো গ্রহণ করা।

যদি তুমি না জান কিভাবে একটি সুপারসোনিক বিমান চালাতে হয়, তাহলে তুমি ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত পৌঁছবে। কিন্তু যদি তুমি সুপারসোনিক বিমান উড়াতে জান, তাহলে তুমি ঐতিহাসিক বা “শাস্ত্রসম্মত” কারনে গাধার পিঠে চড়ার জিদ করবে না। সুপারসনিক বিমান উড়াতে এমনকি তোমার ঘোড়ায় চড়া শিখতেও হবে না।

চলুন আমরা এই নির্বোধ গোঁড়ামি থেকে মুক্তি লাভ করি। আসুন আমরা এই জাতপ্রথা একদম শিকড় সহ উপড়ে ফেলি। আসুন আমরা যেকোনো

ভাবে জাতবর্ণ শ্রেণীবিভাগের পুরোনো মডেলটিকে সমর্থন করার চেষ্টা বন্ধ করে দেই৷ **আসুন আমরা হিন্দুধর্মের মূল বেদের প্রতি সৎ হই৷** আসুন আমরা উপলব্ধি করি জাতপ্রথায় হিন্দু বা বৈদিক কিছু নেই৷ বাস্তবে, জাতপ্রথা হলো সবচেয়ে বেদ বিরোধী বা হিন্দু বিরোধী ধারনা৷

১৮৬৫ সালে যখন দাসপ্রথা বন্ধ হলো, তখন পর্যন্ত পশ্চিম ছিলো পশুর চেয়ে অধম৷ তারপর তারা সতেজ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো৷ তারা তাদের অতীতের কলঙ্কজনক পথকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করেনি৷বাস্তবে, তারা এর জন্য অনুশোচনা করেছে৷এবং তাই আজ তারা বিশ্বের নেতা৷

একই ভাবে আমরাও যদি বিশ্বের নেতা হতে চাই, আসুন আমরাও বিনী-তভাবে আমাদের এই সাঙঘাতিক ভুলকে মেনে নেই৷ আসুন জাতপ্রথা ধ্বংস করাই আমাদের প্রথম গুরুত্ব হোক৷

আসুন আমরা এক ভারত, এক সমাজ, এক জাত হই, এবং একমাত্র মেধাতেই সিদ্ধান্ত হোক, কে কি অর্জন করবে৷

যদি আমরা তা না করি, আমরা বিশ্বের সবচেয়ে অদ্ভুদ সমাজ ব্যব-স্থা হিসেবে রয়ে যাব, যেটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান কিন্তু যন্ত্রনাদায়ক৷ এবং যদি আমরা এই নির্বোধ আবিষ্কারকে সমূলে উচ্ছেদ করতে পারি, আমরা হব দূর্বার৷

জাতপ্রথাকে না বলুন, এই মন্ত্রটিকে নিজের মধ্যে ছড়িয়ে দিন৷

অধ্যায় ৫

বেদে কোনো জাতপ্রথা নেই

এটা দূর্ভাগ্যজনক, আমাদের দেশে যেখানে বেদ আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি, আমরা বেদের মূল শিক্ষা ভুলে গেছি এবং জন্মভিত্তিক জাতপ্রথা ও বিশেষ জাতিতে জন্মগ্রহণকারী লোকেদের বৈষম্য যাদেরকে সামগ্রিকভাবে শূদ্র বলা হয় এ সম্পর্কিত নানা ধরনের ভুল ধারনার ফাঁদে পড়ে গেছি।

কমিউনিস্ট ও পক্ষপাতমূলক ভারততত্ত্ববিদগনের বিভ্রান্তিকর তত্ত্বগুলো ইতিমধ্যেই আমাদের সমাজে মারাত্মক ক্ষতির কারন হয়েছে এবং বিভেদের বীজ রোপন করেছে। এটা দূর্ভাগ্যজনক, এই তথাকথিত দলিতরা নিজেদের জাতি বহির্ভুত মনে করে, এবং ফলশ্রুতিতে আমরা উন্নতি ও নিরাপত্তার জন্য এক হতে ব্যার্থ হচ্ছি। এর একমাত্র সমাধান হলো মূলে ফিরে যাওয়া এবং একে অপরের সাথে আমাদের সম্পর্কের বোঝাপড়া তৈরী করা।

এই অধ্যায়ে, আমরা জাতপ্রথার বাস্তবতাকে মূল্যায়ন করব এবং বর্ণান্তর বা এক বর্ণ থেকে অন্য বর্ণে রূপান্তরের অনেক উদাহরণ দেখব।

কাস্ট বা জাত কি?

জাতের ধারনা তুলনামূলকভাবে নতুন। বেদে এমন কোনো শব্দ নেই যেটা "জাত" শব্দের সমার্থক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যে দুইটি শব্দ সার্বজনীনভাবে 'কাস্ট বা জাত'কে বুঝায় তা হলো জাতি ও বর্ণ। যাহোক, সত্যটি হলো এই তিনটি দ্বারা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়কে বুঝায়।

জাত একটি বিদেশী আবিষ্কার এবং বৈদিক সংস্কৃতির সাথে এর কোনো সাদৃশ্য নেই।

জাতি কি?

জাতি মানে উৎপত্তির ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ। ন্যায়সূত্র বলে, "সমানপ্রসবাত্মিকা জাতি" অর্থাৎ যাদের জন্ম উৎস এক তারা জাতি গঠন করে।

ঋষিগন প্রাথমিকভাবে একটি বিস্তৃত শ্রেণিবিভাগ করেছেন, সে অনুযায়ী এটি চার ভাগ।

- উদ্ভিজ্জ (যেগুলো ভুমি থেকে উদগত হয় যেমন গাছ)
- অণ্ডজ (যেগুলো ডিম থেকে উদগত হয় যেমন পাখি ও সরিসৃপ)
- পিণ্ডজ (স্তন্যপায়ী প্রাণী) এবং
- উষ্মজ (যেগুলো তাপমাত্রা ও চারপাশের অবস্থার কারনে যেগুলো জন্ম নেয় যেমন ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস)

একইভাবে, বিভিন্ন প্রাণী যেমন হাতি, সিংহ, খরগোশ ইত্যাদি ভিন্ন জাতি। একইভাবে সকল মানব একই জাতি গঠন করে। একটি বিশেষ জাতির একই ধরনের শারীরিক বৈশিষ্ট্য থাকে এবং এক জাতি থেকে অন্য জাতিতে পরিবর্তন করা যায় না, ও মিশ্র জাতি উৎপন্ন করা যায় না। জাতি ঈশ্বরের সৃষ্টি।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোনোভাবেই ভিন্ন জাতি নয় কারন তাদের জন্ম উৎসে কোনো পার্থক্য নেই বা শারীরিক গঠনে এমন কিছু নেই যা তাদের পার্থক্য করতে পারে।

পরবর্তীতে, "জাতি" শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে যেকোনো শ্রেণিবিভাগকে সূচিত করতে। সাধারনত রেওয়াজ অনুসারে, আমরা এমনকি ভিন্ন সম্প্রদায়কে ভিন্ন জাতি বলে ডাকি। যাহোক, এটা স্রেফ ব্যবহারের সুবিধা ছাড়া আর কিছুই না। বাস্তবে সকল মনুষ্যই মিলে এক জাতি।

বর্ণ কি?

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য যে শব্দ আসলে ব্যবহৃত হয় তা হলো "বর্ণ", সেটি "জাতি" নয়।

বর্ণ শব্দটি শুধুমাত্র এই চারটির ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় না বরং "দস্যু" ও "আর্য" এদের জন্যও ব্যবহৃত হয়।

বর্ণ হলো এমন একটি যেটা মানুষ পছন্দ অনুযায়ী গ্রহণ করে। যেখানে "জাতি" ঈশ্বর কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে, সেখানে বর্ণ হলো আমাদের পছন্দ।

যে আর্য হতে পছন্দ করবে তাকে আর্য বর্ণ বলা হয়। যে দস্যু হতে চায় সে দস্যু বর্ণ। এভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জন্যও একই।

এজন্যই বৈদিক ধর্মকে বর্ণাশ্রম ধর্ম বলা হয়। বর্ণ শব্দটি স্বয়ং প্রকাশ করে এটা সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা ও গুণের উপর ভিত্তি করে।

যারা বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে জড়িত তারা ব্রাহ্মণবর্ণ বেছে নিয়েছেন। যারা প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধবিগ্রহ বেছে নিয়েছেন তারা ক্ষত্রিয় বর্ণ। যারা অর্থনীতি ও পশুপালন বেছে নিয়েছেন তারা বৈশ্য বর্ণ আর যারা সহায়তামূলক কর্মকাণ্ড বেছে নিয়েছেন তারা শূদ্রবর্ণ। এগুলো স্রেফ বিভিন্ন ধরনের পেশাকে সূচিত করছে এবং কোনো জাতি বা জন্মের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

"পুরুষ সূক্ত"- সবচেয়ে বড় দোষী

ব্রাহ্মণরা ঈশ্বরের মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়রা বাহু থেকে, বৈশ্যরা উরু থেকে আর শূদ্ররা ঈশ্বরের পা থেকে উৎপন্ন হয়েছে এটা প্রমান করার জন্য প্রায়ই পুরুষ সূক্তের মন্ত্র উচ্চারন করা হয়। সুতরাং, এই বর্ণ জন্মভিত্তিক। যাহোক, এর চেয়ে বিভ্রান্তিকর আর কিছু হতে পারে না। আসুন আমরা

দেখি এটা কেনঃ

বেদ বর্ণনা করে ঈশ্বর নিরাকার এবং অপরিবর্তনীয়। তবে কিভাবে নিরাকার ঈশ্বর এমন বিরাট ব্যাক্তির রূপ নিতে পারেন?

যদি বাস্তবে এটা সত্য হতো তাহলে এটা বেদের কর্মতত্বকে অমান্য করতো কারন কর্মতত্ব অনুসারে, যে কারোরই তার কর্ম অনুসারে, জন্ম-গত পরিবার পরিবর্তন হতে পারে। শূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করা যে কেউ (কর্ম অনুসারে) পরবর্তী জন্মে রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যদি শূদ্ররা ঈশ্বরের পা হতে জন্মগ্রহণ করে তিহলে কিভাবে একই শূদ্র আবার ঈশ্বরের হাত থেকে জন্ম নেবে?

আত্মা শ্বাশত এবং কখনো জন্ম নেয় না। আত্মার কোনো বর্ণ থাকতে পারে না। শুধুমাত্র যখন আত্মা মানবরূপে জন্মগ্রহণ করে তখনই তার বর্ণ বেছে নেওয়ার সুযোগ হয়। তাই ঈশ্বরের শরীরের অংশ থেকে বর্ণ এসেছে এর কি অর্থ থাকতে পারে। যদি আত্মাই ঈশ্বরের শরীর থেকে জন্ম নেয়নি, তখন এর কি অর্থ থাকতে পারে, আত্মার শরীর ঈশ্বরের শরীরের অংশ থেকে তৈরী হয়েছে। বেদ অনুসারে, এমনকি প্রকৃতিও শ্বাশত। এবং একই পরমানু বিভিন্ন মানুষের মধ্যে চক্রাকারে যায়। যে কারো ঈশ্বরের শরীর থেকে জন্ম নেয়াটা কৌশলগতভাবেই অসম্ভব, এমনকি যদি আমরা ধরেও নেই ঈশ্বরের শরীর আছে।

“পুরুষ সূক্ত” - এর আসল অর্থ

এই পুরুষ সুক্তটি যজুর্বেদের ৩১ অধ্যায়, অবং এটির ঋগবেদ ও অথ-র্ববেদের সাথে সামান্য পার্থক্য আছে। যজুর্বেদে এটি ৩১/১১। এই মন্ত্রটি আসলে কি বলেছে এটি দেখতে চলুন আমরা এর আগের মন্ত্র ৩১/১০ কি বলেছে দেখি। এটা একটা প্রশ্ন করছে – কে মুখ? কে হাত? কে ঊরু এবং কে পা?

পরবর্তী মন্ত্র উত্তর দিয়েছে - ব্রাহ্মণ হলো মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য ঊরু ও শূদ্র হলো পা।

লক্ষ্য করুন, এটি বলেনি, ব্রাহ্মণ মুখ থেকে “জন্ম নিয়েছে” .... এটা বলেছে

ব্রাহ্মণ "হলো" মুখ। কারন যদি মন্ত্রটি "জন্ম নিয়েছে" বোঝাতো, তাহলে এটি পূর্বের প্রশ্ন "কে হলো মুখ?" এর উত্তর হতো না।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আমি জিজ্ঞেস করি, "দশরথ কে?" এ প্রশ্নের উত্তর যদি দেয়া হয়, "রাম দশরথ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন।" এটা হবে অর্থ-হীন।

আসল অর্থ হলোঃ সমাজে, ব্রাহ্মণগন বা বুদ্ধিজীবিগন মেধা, মস্তিষ্ক বা মুখ গঠন করে, যা চিন্তা করতে ও কথা বলতে পারে। ক্ষত্রিয় বা প্রতিরক্ষা সদস্যরা বাহু গঠন করে যা প্রতিরক্ষা দেয়। বৈশ্য বা উৎপাদক ও ব্যবসায়ী-রা ঊরু গঠন করে যেটা অবলম্বন দান করে ও লালন করে (লক্ষ্য করুন, ঊরুর অস্থি রক্ত উৎপন্ন করে এবং এই অস্থিই সবচেয়ে শক্তিশালী হাড়)। অথর্ববেদে, ঊরুর পরিবর্তে, "মধ্য" শব্দটি ব্যবহার হয়েছে, এর দ্বারা পা-কস্থলী ও শরীরের মধ্য অংশকেও বোঝানো হয়েছে। শূদ্র বা শ্রমশক্তি পা গঠন করে, এটা ভিত্তি তৈরী করে এবং শরীরকে চলতে সাহায্য করে।

পরবর্তী মন্ত্র এই শরীরের অন্য অংশ যেমন মন, চক্ষু ইত্যাদির বর্ণনা করে। পুরুষ সূক্ত সৃষ্টির উদ্ভব ও এর ধারাবাহিকতাকে বর্ণনা করে, এতে মানব সমাজ ও একটি অর্থপূর্ণ সমাজের রাষ্ট্রীয় উপাদান অর্ন্তভুক্ত আছে।

এটা দুঃখের বিষয়, সমাজ ও সৃষ্টির এমন সুন্দর রূপকাশ্রিত বর্ণনাকে বিকৃত করা হয়েছে আর এমন কিছুকে বোঝানো হচ্ছে যেটা বৈদিক তত্ত্বের সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত।

ঈশ্বর ব্রাহ্মণদেরকে মুখের মাংস থেকে, ক্ষত্রিয়কে বাহুর মাংস থেকে এবং এভাবে অন্যদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এ ধরনের উদ্ভট প্রকল্পের বা এর কাছাকাছি কোনোকিছুর বর্ণনা এমনকি ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোতে, মনুস্মৃতি, মহাভারত, রামায়ন ও ভাগবতেও নেই।

এটা নিশ্চিত বেদে ব্রাহ্মণদের উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। আজকের আধুনিক সমাজেও ব্যাপারটা একই আছে। পণ্ডিত ও দক্ষ লোকেরা আমাদের সম্মান পায় কারন তারা পুরো মানবজাতির নির্দেশনা দাতাদের তৈরী করে। যাহোক, যেমনটা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, শ্রমের মর্যাদাকে বেদে সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তাই এখানে বৈ-

ষম্যের কোনো উপাদান নেই।

বৈদিক সংস্কৃতিতে প্রত্যেকে শূদ্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার শিক্ষা অনুসারে সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হয়। এই শিক্ষা সমাপন করাকে দ্বিতীয় জন্ম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তাই এই তিন বর্ণকে দ্বিজ বলা হয়। কিন্তু যারা যেকোনো কারনে অশিক্ষিত থাকে তারা সমাজে প্রত্যাখ্যাত হয় না। তারা শূদ্র হিসেবে থেকে যায় এবং সমাজের জন্য সহায়তামূলক কাজকর্ম করে থাকে।

একজন ব্রাহ্মণের সন্তান, যদি সে লেখাপড়া সমাপনে ব্যার্থ হয়, সে শূদ্র হয়ে যায়। একইভাবে শূদ্রের ও দস্যুর সন্তানও যদি শিক্ষা সমাপন করে, সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হতে পারে। এটা একদম মেধাভিত্তিক ব্যাপার। যেভাবে আজকের দিনে ডিগ্রী প্রদান করা হয়; সেভাবেই বৈদিক ব্যবস্থায় যজ্ঞোপবিত প্রদান করা হতো। অধিকন্তু, প্রতিটি বর্ণের জন্যই, কোনো ধরনের আচরণ বিধি লঙঘন হলে যজ্ঞপোবিত কেড়ে নেওয়ার মত ঘটনা হতো।

বর্ণ পরিবর্তনের উদাহরণ

বৈদিক ইতিহাসে বর্ণ পরিবর্তনের অনেক উদাহরণ আছে।

• ঐতরেয় ঋষি দাস বা অপরাধীর সন্তান ছিলেন কিন্তু উচ্চমার্গীয় ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় উপনিষদ রচনা করেছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণকে ঋগবেদ বুঝার জন্য বিশ্লেষনমূলক গ্রন্থ বিবেচনা করা হয়।

• ঐলুষ ঋষি জুয়াবাজ ও নিচু চরিত্রের দাসীর সন্তান ছিলেন। যাহোক, তিনি ঋগবেদ গবেষণা করেছিলেন এবং বেশ কিছু বিষয় আবিষ্কার করেন। তিনি শুধু ঋষিদের দ্বারা আমন্ত্রিতই হন নি বরং আচার্যও হয়েছিলেন। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২/১৯)

• সত্যকাম জাবাল বেশ্যাপুত্র ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

• প্রীষধ রাজা দক্ষের পুত্র ছিলেন কিন্তু শূদ্র হয়ে গেছিলেন। পরবর্তীতে,

তিনি অনুতপ্ত হয়ে মুক্তির জন্য তপস্যা করেছিলেন।

• (বিষ্ণু পুরাণ ৪/১/১৪) প্রক্ষিপ্ত উত্তর রামায়নের মিথ্যা গল্প অনুসারে যদি তপস্যা শূদ্রের জন্য নিষিদ্ধ হতো, কিভাবে তাহলে প্রীষধ এমনটা করলেন?

• নেদিষ্ট রাজার পুত্র নবগ, বৈশ্য হয়েছিলেন। তার অনেক পুত্র পুনরায় ক্ষত্রিয় হয়েছিলেন। (বিষ্ণু পুরাণ ৪/১/১৩)

• নবগের (বৈশ্য) পুত্র ধৃষ্ট ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন, এবং তাঁর পুত্র ক্ষত্রিয় হয়েছিলেন (বিষ্ণু পুরাণ ৪/২/২)

• তার বংশের কেউ কেউ পরবর্তীতে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। (বিষ্ণু পুরাণ ৯/২/২৩)

• ভাগবত অনুসারে, অগ্নিবেশ্য রাজার ঘরে জন্ম নিয়েও ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

• বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত অনুসারে রাথোতার ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

• হারিত ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন যদিও ক্ষত্রিয় ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। (বিষ্ণু পুরাণ ৪/৩/৫)

• শৌণক ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেও ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। (বিষ্ণু পুরাণ ৪/৮/১)। বাস্তবে, বায়ু পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ ও হরিবংশ পুরাণ অনুসারে শৌণক ঋষির পুত্রেরা চারটি সকল বর্ণেই অর্ন্তভুক্ত ছিলেন।

• একই উদাহরণ গ্রীৎসমদ, বিতব্যায় ও বৃৎসমাতির ক্ষেত্রেও আছে।

• মাতঙ্গ চণ্ডালের পুত্র কিন্তু ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

• রাবন পুলস্ত্য ঋষির পুত্র ছিলেন কিন্তু রাক্ষস হয়েছিলেন।

• প্রবৃদ্ধ রঘু রাজার পুত্র ছিলেন কিন্তু রাক্ষস হয়েছিলেন।

• ত্রিশঙ্কু রাজা ছিলেন কিন্তু চণ্ডাল হয়ে গিয়েছিলেন।

• বিশ্বামিত্রের পুত্রেরা শূদ্র হয়েছিলেন। বিশ্বামিত্র নিজে ছিলেন ক্ষত্রিয় যিনি পরে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

• বিদুর দাসীপুত্র ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন ও হস্তিনাপুর সাম্রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন।

"শূদ্র" শব্দটি বেদে ২০ বারের কাছাকাছি এসেছে। কোথাও এটিকে মর্যাদা হানিকর হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। কোথাও উল্লেখ নেই শূদ্রেরা অচ্ছুৎ, জন্মভিত্তিক, বেদ পাঠে অননুমোদিত, অন্য বর্ণ থেকে অবস্থানে নিকৃষ্টতর বা যজ্ঞে অননুমোদিত।

বেদে, শূদ্র অর্থ হলো একজন পরিশ্রমী ব্যাক্তি। (তপসে শূদ্রম - যজুর্বেদ ৩০/৫)। এজন্যেই পুরুষ সুক্ত তাদেরকে পুরো মানব সমাজের ভিত্তি বলেছে।

যেহেতু চার বর্ণ পছন্দ অনুসারে চার ধরনের কর্মকে বুঝায়, বেদ অনুসারে একই ব্যাক্তি বিভিন্ন অবস্থায় চার বর্ণেরই বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। প্রত্যেকে সকলে এই চার বর্ণের অর্ন্তভুক্ত। যাহোক, সহজভাবে বলতে গেলে, আমরা বর্ণের প্রতিনিধি হিসেবে প্রধান পেশাকে উল্লেখ করছি।

তাই, বৈদিক ভাবনা অনুসারে সকল মানুষ তাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী চারটি বর্ণেই প্রযত্নশীল হবে। এটাই পুরুষ সুক্তের মূল বিষয়।

বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, অঙ্গিরা, গৌতত্র, বাসুদেব ও কন্ব সকল চারটি বর্ণের বৈশিষ্ট্যকে প্রদর্শন করে। তারা বৈদিক মন্ত্রগুলোকে উন্মোচন করেছেন, দস্যুদের ধ্বংস করেছেন, শারীরিক পরিশ্রম করেছেন ও সমাজের কল্যানের জন্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা করেছেন।

আমাদেরও উচিত তাদের অনুকরন করা।

সারসংক্ষেপ

সংক্ষেপে, আমরা দেখি বৈদিক সমাজ সকল মানবকে একটি মাত্র জা-

তিগোষ্ঠী বিবেচনা করে, শ্রমের মর্যাদাকে তুলে ধরে ও সকল মনুষ্যের জন্য সমান সুযোগ দান করে তাদের নিজেদের পছন্দমত বর্ণ বেছে নিতে দিয়ে।

বেদের আচরণে জন্মভিত্তিক বৈষম্যের কোনো উপাদানই নেই।

আমরা যেন সকলে একটি যৌথ পরিবারের মত একত্রিত হই, জন্মভি-ত্তিক বৈষম্যের যে কোনো রীতির শেষ উপাদানটুকুও বাতিল করে দিন এবং প্রত্যেককে ভাই বোন হিসেবে গ্রহণ করুন।

বেদে বর্ণপ্রথার ভিত্তিহীন দাবী করে যারা আমাদেরকে ভুলপথে চালিত করতে চায় আমরা যেন তাদের সেসকল পরিকল্পনা ব্যাহত করে দেই এবং দস্যু, দাস, রাক্ষসদের তথা অপরাধীদের ধ্বংস করে দেই।

আমরা সকলেই যেন বেদের আশ্রয়ে আসি এবং এক পরিবার হয়ে মান-বতাকে শক্তিশালী করতে একত্রে কাজ করি।

২য় অংশঃ মনুস্মৃতি ও জাতপ্রথা

অধ্যায় ৬

মনুস্মৃতি ও শূদ্র

অগ্নিবীরকে যদি ভারতের দুইটি উপদ্রবের তালিকা করতে বলা হয়, অগ্নি-বীর সন্দেহাতীতভাবে প্রথমে রাখবে জন্মভিত্তিক জাতপ্রথা আর দ্বিতী-য়টি হবে লিঙ্গ বৈষম্য।

হ্যা, আজকের ভারত চ্যালেঞ্জের আধিক্যে জর্জরিত। দূর্নীতি, মৌলবাদ, সন্ত্রাস, ধর্মান্তর, নৈতিক অধঃপতন, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্য সমস্যা, পয়ঃ নিষ্কাষন সমস্যা ও আরো অনেক কিছু। কিন্তু এ সকল সমস্যা ও হুমকী থাকা সত্ত্বেও, প্রধান দুইটি সমস্যা যদি ধরা হয়, তা হবে জাতপ্রথা ও লিঙ্গ বৈষম্য। এ দুটি সমস্যা অন্য সমস্যাগুলো থেকে বড় ব্যবধানে এগিয়ে।

কারন একদিকে না একদিকে, বাকী সমস্যাগুলো এই দুটি প্রধান সন্মান-নাশক সমস্যার সাথে যুক্ত। অন্যথায় আমাদের সংস্কৃতি গৌরবময়। যত-ক্ষন না এই দুটি সমস্যা যেগুলো আমাদের অতীত ও বর্তমান সমস্যার মূল কারন, এগুলোকে গোঁড়া থেকে উপরে ফেলা না হবে, আমাদের গৌ-রবময় ভবিষ্যতের আশা উন্মাদের দৃষ্টিভ্রমের মত হবে।

অন্য ভাষায়, একটি উন্নত ও শক্তিশালী সমাজ বর্ণপ্রথা ও

লিঙ্গ বৈষম্যের সাথে সহাবস্থান করতে পারে না।

দয়া করে নোট করুন, জাতিবাদ আর লিঙ্গ বৈষম্য হিন্দু সমস্যা বিশেষ নয়। বরং, এগুলো অধিকতর সাংস্কৃতিক বিষয়। লিঙ্গ বৈষম্য যুগ যুগ ধরে একটি বৈশ্বিক বিষয়। দক্ষিন এশিয় উপদ্রব এই জাতিবাদ এখানে জন্ম নেয়া সকল সমাজ ও ধর্মে প্রভাব রেখেছে, ঠিক যেমন গায়ের রঙ- -ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা একটি পশ্চিমা সমস্যা।

যাহোক, সবচেয়ে প্রাচীনতম সংস্কৃতি ও অন্য সকল ধর্মের মূল উৎস হিসেবে হিন্দুধর্মকে উৎপত্তিস্থল দুষিত করার দোষ মেনে নিতে হবে। কারন যখনই এই দুই উৎপাতকে সহ্য করা হলো, সমাজ দূর্বল হয়ে গেল ও বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মে প্লাবিত হয়ে গেল, এটা সমাজকে আরো দূর্বল- তার দিকে নিয়ে গেল। এইগুলোই বর্তমান বিশৃঙ্খলাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং অতীতের সকল বিশৃঙ্খলতাকে নেতৃত্ব দিয়েছে, এগুলো আমরা ইতিহাস থেকে জেনেছি।

এটা আশ্চর্যজনক, এমনকি আজকের দিনেও এই দুই উপদ্রবের সমর্থক- দের দেখা যায়, এরা হয় বুদ্ধিজীবি নয়তো শিক্ষিত অংশে।

জন্ম ভিত্তিক গরিমার ভাইরাস এতটাই শক্তিশালী যে, এটা বিচারবুদ্ধিস- ম্পন্ন উন্মাদ তৈরী করে। এই ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদেরকে পণ্ডিত এবং সমসাময়িক কালে হিন্দুধর্মের নেতা হিসেবেও বিবেচনা করা হয়!

তারা সরলভাবে প্রাচীন গ্রন্থগুলোর দিকে নির্দেশ করে যেগুলো এই উপ- দ্রবগুলোকে ন্যায্যতা দান করে এবং তারপর এই আবর্জনাগুলোকে হজম করার পিছনের "বিজ্ঞানকে" প্রমাণ করার চেষ্টা করে। সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ, সামাজিক ব্যবস্থার প্রাচীনতম গ্রন্থ মনুস্মৃতিকে বলির পাঁঠা হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

পরবর্তী দুই অধ্যায়ে আমরা মনুস্মৃতিকে মূল্যায়ন করব।

মনুস্মৃতি ও দলিত আন্দোলনঃ

মনুস্মৃতি বৈদিক সংস্কৃতির সবচেয়ে বিতর্কিত গ্রন্থ। পৃথিবীতে নৈতিকতা ও

আইনের প্রথম সঙ্কলন হিসেবেই শুধু এর পরিচিতি সীমাবদ্ধ নেই অধি-কন্তু জাতপ্রথার অমার্জিত প্রবর্তক হিসেবেও জগতে এর পরিচিতি আছে। বর্তমান সময়ের পুরো দলিত আন্দোলনটি মনুবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

যেখানে জাতিবাদীদের কাছে মনু হলেন নায়ক, সেখানে দলিত নেতাদের কাছে মনু মহাশত্রু হিসেবে চিত্রায়িত। অগ্নিবেশ, মায়াবতী ও অন্যান্য অনেকে বিপুল সংখ্যক মনুস্মৃতির কপি পুড়িয়েছে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রেম প্রদর্শনের জন্য। মনুকে শয়তান হিসেবে চিত্রায়িত করে অনেক সিনেমা তৈরী করা হয়ে আসছে যেন পণ্ডিতরা নিম্নবর্ণের লোকেদের উপর নৃশংস বর্বরতা চাপিয়ে দিচ্ছে তার বিকৃত আকাঙ্খা চরি-তার্থ করতে। হিন্দুধর্ম ও বেদকে আঘাত করার জন্য এই নোংরা লোকেদের কাছে মনুস্মৃতি পছন্দনীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। এইটি হিন্দুধর্ম থেকে ধর্মা-ন্তরিত হয়ে বেরিয়ে যাওয়াকে উৎসাহিত করার সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র হয়ে উঠেছে। এবং আশ্চর্যজনকভাবে মনুকে আঘাতকারী বেশিরভাগ লোকেরাই সম্ভবতঃ মনুস্মৃতিকে পাঠ হিসেবে কখনই গুরুত্বই দেয়নি!

বিপরীত দিকে, হিন্দুধর্মের মধ্যকার স্যাডিস্টরা (যারা আঘাত পেতে ভালোবাসে) যারা নিজেদেরকে ও অন্যকে তাদের তথাকথিত জন্মভি-ত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে বোকা বানাতে চায়, তাদের জন্য মনুস্মৃতি হলো একটি ধর্মীয় গ্রন্থ যেটা তাদেরকে একশ্রেণীর লোকদের সাথে ন্যায্য আচরন না করতে ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব দেয় কারন ঐ শ্রেণীর লোকেরা বিশেষ পরিবারে জন্মেনি। তারা মনুস্মৃতির মিথ্যা প্রক্ষিপ্ত মন্ত্রগুলো উল্লেখ করে, যেগুলো জাতিবাদ ও লিঙ্গ বৈষম্যের গন্ধযুক্ত, সুবিধামত সেই শ্লোকের আধিক্যকে অস্বীকার করে যেগুলো (এই জাতিবাদ ও লিঙ্গবৈষম্যের) সম্পূর্ণ বিপরীত।

এই দুই শক্তির মধ্যকার তীব্র লড়াই ভারতের বর্তমান সস্তা রাজনীতিকে আকৃতি দান করেছে, কিন্তু এটি বিগত ১,০০০ বছরের বিদেশী আক্রমনের মূল কারন হয়েছে। এই ঘৃনিত জাতপ্রথাই ছিলো প্রধান কারন যে আমরা বর্বর আক্রমনের হাত থেকে জাতিকে প্রতিরক্ষা করতে পারিনি। এই অযৌক্তিক জাতপ্রথাই ছিলো ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হয়ে যাওয়ার মূল

কারন। এবং এই বিব্রতকর জাতপ্রথাই হলো মূল কারন যে, এত মেধাবী ও বুদ্ধি সম্পদ থাকার পরও ভারত উন্নতি ও শক্তির দৌড়ে এখনো একটি কুঁড়ে, বশংবদ মেরুদণ্ডহীন শামুকের মত।

তাই, মনুস্মৃতিকে পুনরায় পাঠ করাটা অতিব জরুরী এবং পরীক্ষা করে দেখা উচিত এটা আসলে কিসের পক্ষে দাড়াঁয়।

মনুস্মৃতির তিনটি দোষ

মনুস্মৃতির বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আছে। সেগুলো হলোঃ

• মনু জন্মভিত্তিক জাতপ্রথাকে স্থাপন করেছেন।

• মনু শূদ্রদের জন্য কঠিন শাস্তিকে বৈধতা দান করেছেন এবং উচ্চ জাতের বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের জন্য বিশেষ সুবিধা দিয়েছেন।

• মনু ছিলেন নারী বিরোধী এবং তাদেরকে নিন্দা করেছেন। তিনি নারীদের কম অধিকার দিতেন।

এই অধ্যায়ে, আমরা 'মনু জন্মভিত্তিক জাতপ্রথাকে স্থাপন করেছেন' এই প্রথম অভিযোগটি খণ্ডন করব।

মনুস্মৃতি এমন একটা সময়ে আবির্ভুত হয়েছিলো যখন জন্ম ভিত্তিক জাতপ্রথা ধারনাটিই ছিলো না। মনুস্মৃতি কোথাও জন্মভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে সমর্থনও করে না।

মনুস্মৃতি ও বর্ণব্যবস্থা

মহর্ষি মনু বেদ হতে অনুপ্রেরণা নিয়েছেন এবং একটি সামাজিক নিয়ম প্রস্তাব করেছেন, যার ভিত্তি হবে ব্যাক্তির গুণ, কর্ম আর প্রকৃতি। এটাকেই বর্ণপ্রথা বলে। (জাতপ্রথা আর বর্ণপ্রথা ভিন্ন জিনিস) বর্তমানে বর্ণ শব্দটি মূল "বৃঞ্জা" থেকে এসেছে যার অর্থ হলো "পছন্দ।" একই ধরনের ব্যবহার ঘটে সাধারনভাবে ব্যবহৃত "বরন" শব্দে এর অর্থও হলো "পছন্দ করা" অথবা 'বর' এর অর্থ হলো স্বামী, একটি মেয়ে যাকে পছন্দ করে নিয়েছে। এছাড়াও এটা দেখায়, বৈদিক প্রথায় একজন নারীর তার স্বামীকে পছন্দ

করে নেওয়ার সম্পূর্ণ আধিকার আছে।

মনুস্মৃতির বর্ণ ব্যবস্থাকে উপস্থাপন করে, কিন্তু জন্মভিত্তিক জাত ব্যব-স্থাকে উপস্থাপন করে না তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায়ে চার বর্ণের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কোনো জাত বা গোত্রের কথা উল্লেখ নেই। যদি জাত বা গোত্র প্রয়োজনীয় হতো, তাহলে মনু অবশ্যই উল্লেখ করতেন কোন জাতের লোক ব্রাহ্মণের অর্ন্তভুক্ত হবে, কোন জাতের লোক ক্ষত্রিয় হবে, কোন জাতের লোক বৈশ্য হবে এবং কারাই বা শূদ্র হবে।

এটা আরো বুঝিয়ে দেয়, যারা নিজেদেরকে জন্মভিত্তিতে ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের মনে করে এটার আসলে প্রমাণ করার মত কোনো সাক্ষ্য নেই। তারা শুধুমাত্র এটা প্রমাণ করতে পারে, তাদের পূর্বপুরুষের কয়েক প্রজন্ম নিজেদেরকে উচুজাত উল্লেখ করতেন। কিন্তু এটা প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই, তারা সভ্যতার শুরু থেকেই উচ্চবর্ণের ছিলেন। এবং যেহেতু তারা এটা প্রমাণ করতে পারেনা, কিভাবে তারা দৃঢ়তার সাথে বলেন একজন তথাকথিত জন্মভিত্তিক শূদ্র কয়েক প্রজন্ম আগে ব্রাহ্মণ ছিলো না? এবং একইভাবে তারাও কয়েক প্রজন্ম আগে শূদ্র ছিলো না!

বাস্তবে, মনুস্মৃতি ৩/১০৯ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন, যে ব্যাক্তি নিজের গোত্র বা পরিবারকে গুনকীর্তন করে খায়, সে নিজের বমি নিজে খায় বিবেচনা করা হয়।

মনুস্মৃতি অনুসারে আত্মঘোষিত জন্মভিত্তিক ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের লোকেরা বিশ্বাস করে, বিশেষ সুবিধা দাবী করার জন্য তাদের গোত্র বা বংশের গুনকীর্তন করা হলে এটা তাদেরকে দোষারোপের উপযুক্ত করবে।

মনুস্মৃতি ২/১৩৬ বলে, কেউ সম্মান অর্জন করে সম্পদের জন্য, কেউ সঙ্গীর জন্য, কেউবা বয়স, কর্ম ও জ্ঞানের জন্য, এসবের ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্য। এখানে সম্মান অর্জন বা দাবী করার জন্য পরিবার, গোত্র, জাত, বংশ বা অন্য বিষয়ের উল্লেখ নেই।

বিভিন্ন বর্ণে যাওয়া আসা

মনুস্মৃতি ১০/৬৫ বলে, ব্রাহ্মণ শূদ্র হতে পারে এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণ হতে পারে। একইভাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা তাদের বর্ণ পরিবর্তন করতে পারে।

মনুস্মৃতি ৯/৩৩৫ অনুসারে, যদি একজন শূদ্র (অশিক্ষিত) একজন শিক্ষিতকে সেবা করে, ভদ্র হয়, অহং বোধ থেকে মুক্ত থাকে এবং সম্মানীয় জ্ঞানীর সহচর্যে থাকে, সে এক উন্নত জন্ম ও মর্যাদা লাভ করেছে বিবেচিত হয়।

মনুস্মৃতির বিভিন্ন শ্লোকে বর্ণনা করা আছে, উচ্চ বর্ণের অর্ন্তগত একজন ব্যাক্তি শূদ্রের (অশিক্ষিত) অবস্থায় পতিত হয় যদি সে ভালো কর্ম না করে। উদাহরণস্বরূপঃ

মনুস্মৃতি ২/১০৪ যে ব্যাক্তি দিনে দুইবার সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপাসনা করে না সে শূদ্র বলে গন্য হবে।

মনুস্মৃতি ২/১৭২ যারা বেদ শিক্ষার সাথে অভিষিক্ত হবে না তারা শূদ্র।

মনুস্মৃতি ৪/২৪৫ একজন ব্রাহ্মণ উন্নত চরিত্র ব্যাক্তির সহচর্যে থেকে এবং দুষ্টসঙ্গ ত্যাগ করে মেধা অর্জন করে। বিপরীতে, যদি সে কুসঙ্গে পতিত হয়, সে শূদ্র হয়ে যায়।

সুস্পষ্টভাবে, ব্রাহ্মণ বলতে পণ্ডিত ব্যাক্তিদের বুঝানো হচ্ছে যারা মহৎ কর্ম করেন। এবং শূদ্র বলতে অশিক্ষিত লোকেদের বুঝানো হচ্ছে। এতে জন্মভিত্তিক কিছু নেই।

মনুস্মৃতি ২/১৬৮ একজন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যারা বৈদিক অনুশাসন বুঝা ও অনুসরন করা ছাড়া অন্য প্রয়াস চালায়, তারা শূদ্র হয়ে যায় এবং তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মও বৈদিক জ্ঞানের অজ্ঞতার অসুবিধায় পরে।

মনুস্মৃতি অনুসারে, বর্তমানে কিছু ব্যাতিক্রম ছাড়া ভারতের প্রায় পুরো জনগোষ্ঠী হলো শূদ্র। এর কারন হলো আমরা বৈদিক ধারনা মেনে চলছি না এবং আমরা বেদবিরোধী কর্মকাণ্ড যেমন দূর্নীতি, জাতপ্রথা, স্বার্থপরতা, কুসংস্কার, যুক্তিহীনতা, লিঙ্গ বৈষম্য, চাটুকারীতা, অনৈতিকতা ইত্যা-

দিতে লিপ্ত আছি।

মনুস্মৃতি ২/১২৬ এমনকি যদি সে ব্রাহ্মণও হয়, কিন্তু সে ব্যাক্তি ভদ্রভাবে অভিবাদনের উত্তর না জানায়, সে প্রকৃতপক্ষে শূদ্র (অশিক্ষিত ব্যাক্তি)

এমনকি শূদ্ররাও শিক্ষা দিতে পারে

যদিও শূদ্র অর্থ হলো অশিক্ষিত ব্যাক্তি, একজন শূদ্রও তার কাছে থাকা বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারে। উদাহরনস্বরূপ,

মনুস্মৃতি ২/২৩৮ প্রত্যেকের উচিত জ্ঞান অর্জন করা, এমনকি নিচু পরিবারে জন্ম গ্রহণকারীর থেকেও, একইভাবে, প্রত্যেকের উচিত মহীয়সী নারীদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা এমনকি যদি তার (সেই নারীর) পরিবার মানসম্মত নাও হয়।

মনুস্মৃতি ২/২৪১ যদি দরকার হয়, যে কেউ জ্ঞান অর্জন করতে পারে, একজন অব্রাহ্মণ থেকেও; এবং তার উচিত এমন শিক্ষককে অনুসরণ করা ও সেবা করা, যতক্ষন শিক্ষা শেষ হবে না।

ব্রাহ্মণের অবস্থান কর্মের দ্বারা অর্জিত

মনুস্মৃতি অনুসারে, প্রত্যেককে ব্রাহ্মণের গুনাবলী অর্জন করতে হয়। শিশুকালে, সন্তানদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষন করে, সে অনুসারে পিতামাতা তাদের সন্তানদেরকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের বিশেষায়িত শিক্ষার জন্য পাঠানো উচিত। অনেক ব্রাহ্মণ পিতামাতা আশা করেন তাদের শিশুরাও ব্রাহ্মণ হোক। কিন্তু সেটি যথেষ্ট নয়। কেউ ব্রাহ্মণ হয় শুধুমাত্র যদি সে শিক্ষা সমাপন করে, শুধু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নিয়ে বা গুরুকুলে ব্রাহ্মণ কোর্সে ভর্তি হয়ে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না।

মনুস্মৃতি ২/১৫৭ শিক্ষাহীন একজন ব্রাহ্মণ, কাঠের তৈরী হাতি বা চামড়ার তৈরী হরিণের সমান। তারা স্রেফ নামকাওয়াস্তে (ব্রাহ্মণ) এবং বাস্তবে নয়।

মনুস্মৃতি ২/২৮ সে ব্যাক্তিকেই সঠিকভাবে ব্রাহ্মণ বলা যায়, শুধুমাত্র যারা ধর্মগ্রন্থগুলো পাঠ করেছে, শৃঙ্খলা, মহান, যজ্ঞ, দায়িত্ব পালন করেছে, বিজ্ঞান ও যোগ, দান ও লক্ষ্য অর্জনকারী কাজ করেছে।

শিক্ষাই হলো সত্যিকারের জন্ম

মনু অনুসারে, শিক্ষার পরেই প্রকৃত জন্ম হয়। সকল মনুষ্যই শূদ্র তথা অশিক্ষিত থাকে যখন জন্ম নেয়। যারা তাদের শিক্ষা সমাপন করেছে তাদের নবজন্ম হয়েছে ধরা হয়। তাদেরকে দ্বিজ বা দ্বিতীয় জন্ম বলা হয়। যারা তাদের শিক্ষা শেষ করতে পারেনি তারাই শূদ্র থাকে। এখানে জন্ম বা বংশধারার কিছু নেই। এটা সম্পূর্ণটাই বিশুদ্ধ মেধাগত ব্যাপার।

মনুস্মৃতি ২/১৪৮ যখন একজন বেদজ্ঞানী শিক্ষক একজন ছাত্রকে গায়ত্রি বিজ্ঞানের শিক্ষা দেন (যেটা বেদের সকল মূলনীতির সারসংক্ষেপ এবং যুক্তিপূর্ণ জীবনধারা), তখন ছাত্রের প্রকৃত জন্ম হয়। এই জন্ম মৃত্যুর বা ধ্বংসের ঝুঁকিহীন এবং ছাত্রকে অমৃতের পথে নিয়ে যায়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের কথা ভুলে যান; শিক্ষা গ্রহণ না করলে কেউ মানুষ হিসেবে গন্য হয় না।

মনুস্মৃতি ২/১৪৬ যে শিক্ষক শিক্ষা দান করেন তিনি পিতা, তিনি জন্মদাতা পিতার চেয়ে মহান। জ্ঞান শিক্ষক দান করেন, সেটা আত্মায় থেকে যায় এমনকি মৃত্যুর পরেও এবং তাঁকে অমরত্বের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু জন্ম-দাতা পিতা যে শরীর দান করেন সেটা মৃত্যুর সাথে ধ্বংস হয়ে যায়।

মনুস্মৃতি ২/১৪৭ পিতা মাতার জনন আকাঙ্খার পর মাতৃগর্ভ হতে যে জন্ম সেটা সাধারণ জন্ম। প্রকৃত জন্ম হয় যখন ব্যাক্তি তার শিক্ষা সমাপন করে।

মনুস্মৃতি অনুসারে জাতিবাদী শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর জন্য বংশধারা উল্লেখ করাটা অত্যন্ত বোকামীর কাজ। গোত্র উল্লেখ করার পরিবর্তে, অধিকতর শিক্ষিত এতেই কোনো ব্যাক্তি শ্রেষ্ঠ হয়।

মনুস্মৃতি ১০/৪ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য শিক্ষা গ্রহণের পর দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে। শূদ্র, যারা শিক্ষা সমাপন করতে পারেনি, তারা চতুর্থ বর্ণ। আর্য-দের মধ্যে পঞ্চম কোনো বর্ণ নেই।

এটি আরো বুঝায়, কোনো ব্যাক্তি শিক্ষা সমাপন করতে না পারলেও এটি কাউকে দূর্জন করে না। তিনিও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যাক্তি হিসেবে বিবেচিত

হবেন যদি তিনি মহৎকর্মা হন।

যদি তিনি তার শিক্ষা সমাপন করেন, তিনিও দ্বিজ হবেন। শূদ্র হলো একটি বিশেষন এবং কোনো জাতের পরিভাষা নয়।

কখনো নিচু পরিবারে জন্মেছে বলে কাউকে অবজ্ঞা করবেন নাঃ

আরো নিশ্চিত করবেন, কোনো ব্যাক্তি শুধুমাত্র শিক্ষা, সম্পদ বা সমাজে সাফল্যের অন্যান্য পরিমাপে পিছিয়া পরা পরিবারে জন্মেছে বলে যেন অপমানিত বা সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, মহর্ষি মনু অত্যন্ত পরিষ্কার-ভাবে নিয়ম স্থাপন করেছেনঃ

মনুস্মৃতি ৪/১৪১ যারা বিকলাঙ্গ, যারা অশিক্ষিত, বৃদ্ধ, রূপহীন, সম্পদহীন বা যারা নিচু পরিবার থেকে এসেছে কখনোই তাদেরকে সম্মান ও অধিকা-রকে অবজ্ঞা করবে না। এগুলো কোনো ব্যাক্তিকে বিচারের মাপকাঠি নয়।

প্রাচীন সমাজে বর্ণান্তরের উদাহরণ

বর্ণের ধারণা যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বেশ্য শূদ্র এসব মেধাভিত্তিক, জন্ম ভিত্তিক নয় এবং স্রেফ তত্ত্বীয় ধারণা নয়। বর্ণপ্রথা প্রাচীন যুগেও অনুশী-লন করা হতো। আমাদের উপর বড় দূর্গতি নেমে আসে যখন আমাদের বিপথগামী পূর্বপুরুষেরা এই বিজ্ঞানসম্মত মেধাভিত্তিক বিষয়টিকে জন্মভিত্তিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে নিয়েছেন। আজকে আমরা যে দূর্ভোগের মুখোমুখি হচ্ছে এর কারন এইটি।

এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলোঃ

- ঐতরেয় ঋষি দাস বা অপরাধীর সন্তান ছিলেন কিন্তু উচ্চমার্গীয় ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় উপনিষদ রচনা করেছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণকে ঋগবেদ বুঝার জন্য বিশ্লেষনমূলক গ্রন্থ বিবেচনা করা হয়।

- ঐলুষ ঋষি জুয়াবাজ ও নিচু চরিত্রের দাসীর সন্তান ছিলেন। যাহোক, তিনি ঋগবেদ গবেষণা করেছিলেন এবং বেশ কিছু বিষয় আবিষ্কার করেন। তিনি শুধু ঋষিদের দ্বারা আমন্ত্রিতই হন নি বরং আচার্যও হয়েছি-

লেন। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২/১৯)

• সত্যকাম জাবাল বেশ্যাপুত্র ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

• প্রীষধ রাজা দক্ষের পুত্র ছিলেন কিন্তু শূদ্র হয়ে গেছিলেন। পরবর্তী-তে, তিনি অনুতপ্ত হয়ে মুক্তির জন্য তপস্যা করেছিলেন। (বিষ্ণু পুরাণ ৪/১/১৪) প্রক্ষিপ্ত উত্তর রামায়নের মিথ্যা গল্প অনুসারে যদি তপস্যা শূদ্রের জন্য নিষিদ্ধ হতো, কিভাবে তাহলে প্রীষধ এমনটা করলেন?

• নেদিষ্ট রাজার পুত্র নবগ, বৈশ্য হয়েছিলেন। তার অনেক পুত্র পুনরায় ক্ষত্রিয় হয়েছিলেন। (বিষ্ণু পুরাণ ৪/১/১৩)

• নবগের (বৈশ্য) পুত্র ধৃষ্ট ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন, এবং তাঁর পুত্র ক্ষত্রিয় হয়েছিলেন (বিষ্ণু পুরাণ ৪/২/২)

• তার বংশের কেউ কেউ পরবর্তীতে আবার ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। (বিষ্ণু পুরাণ ৯/২/২৩)

• ভাগবত অনুসারে, অগ্নিবেশ্য রাজার ঘরে জন্ম নিয়েও ব্রাহ্মণ হয়েছি-লেন।

• বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত অনুসারে রাথোতার ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

• হারিত ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন যদিও ক্ষত্রিয় ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। (বিষ্ণু পুরাণ ৪/৩/৫)

• শৌণক ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেও ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। (বিষ্ণু পুরাণ ৪/৮/১)। বাস্তবে, বায়ু পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ ও হরিবংশ পুরাণ অনুসারে শৌণক ঋষির পুত্রেরা চারটি সকল বর্ণেই অর্ন্তভুক্ত ছিলেন।

• একই উদাহরণ গ্রীৎসমদ, বিতব্যায় ও বৃৎসমাতির ক্ষেত্রেও আছে।

• মাতঙ্গ চণ্ডালের পুত্র কিন্তু ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। (মহাভারত অনুশাসন পর্ব অধ্যায় ৩)

• রাবন পুলস্ত্য ঋষির পুত্র ছিলেন কিন্তু রাক্ষস হয়েছিলেন।

• প্রবৃদ্ধ রঘু রাজার পুত্র ছিলেন কিন্তু রাক্ষস হয়েছিলেন।

• ত্রিশঙ্কু রাজা ছিলেন কিন্তু চণ্ডাল হয়ে গিয়েছিলেন।

• বিশ্বামিত্রের পুত্রেরা শূদ্র হয়েছিলেন। বিশ্বামিত্র নিজে ছিলেন ক্ষত্রিয় যিনি পরে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

• বিদুর দাসীপুত্র ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন ও হস্তিনাপুর সাম্রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন।

• বৎস ঋষি হয়েছিলেন যদিও শূদ্র ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২/১৯)

প্রক্ষিপ্ত মনুস্মৃতির অনেক শ্লোক বর্ণনা করে (১০/৪৩-৪৪) পূর্বে কিছু জাতি ক্ষত্রিয় ছিলো কিন্তু পরবর্তীতে শূদ্র হয়ে গেছে। এই শ্লোকগুলো প্রক্ষিপ্ত কিন্তু প্রমাণ করে বর্ণান্তরের ধারনা বিদ্যমান ছিলো। যে জাতিগুলোর উল্লেখ করা হয়েছেঃ পৌণ্ড্রক, অদ্রু, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পরদ, পলহব, চীন, কিরাত, দারাদ, খাস।

মহাভারত অনুশাসন পর্ব ৩৫/১৭-১৮ নিচের গুলো যুক্ত করেঃ মেকল, লাত, কণ্বশিরা, শৌনডিক, দারভা, চৌর, শবর, বর্বর।

বেশকিছু গোত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং দলিতদের মধ্যে সাধারন, এটা ইঙ্গিত দেয়, তারা সকলে একই পরিবার থেকে এসেছে কিন্তু নিঃসন্দেহে এই নির্বোধ জাতিপ্রথার ফাঁদে পড়েছে।

শূদ্রদের জন্য সম্মান

মনু ছিলেন মহান মানবতাবাদী। তিনি জানতেন সকল শূদ্ররা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের শিক্ষা পরিত্যাগ করবে না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কোনো ব্যাক্তি তার জীবনের শুরুর দিকে শিক্ষাকে অবজ্ঞা করেজেন তার মানে এই নয়, এই ভুলের জন্য তাকে সারাজীবন দণ্ড দিতে হবে। তাই সে নিশ্চিত করে, এমনকি শূদ্ররাও সমাজে তাদের প্রাপ্য সম্মান পাবে। তিনি কখনোই

শূদ্রদের জন্য কোনো অপমানকর বিশেষন ব্যবহার করেননি। বিপরীতে, মনু শূদ্রদের জন্য বেশকিছু সম্মানজনক বিশেষনের দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

মনুসংহিতা অনুসারে, শিক্ষার অভাবে অরক্ষিত, শূদ্রগন সমাজের বাকীদের থেকে বেশি বেশি সংবেদনশীলতা আশা করে। এই ধরনের কিছু উদাহরণ আমরা পূর্বে দেখেছি। এখানে আরো কিছু দেয়া হলো।

মনুস্মৃতি ৩/১১২ যদি একজন শূদ্র বা বৈশ্য অতিথিরূপে আসেন, পরিবার তাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় ভোজন করাবেন।

মনুস্মৃতি ৩/১১৬ একজন গৃহকর্তা পণ্ডিত ও চাকরদের (শূদ্রদের) তাদের পরিতৃপ্তভাবে খাওয়ানোর পর বাকী খাদ্য থেকে সে খাবার গ্রহণ করবে।

মনুস্মৃতি ২/১৩৭ একজন অতিবৃদ্ধ শূদ্র, সম্পদ, সহযোগী, বয়স, কর্ম ও জ্ঞান নির্বিশেষে যেকোন ব্যাক্তির তুলনায় অধিকতর সম্মান আশা করে। এই বিশেষ ব্যবস্থা শুধুমাত্র শূদ্রদের জন্য।

বেদ মনুস্মৃতির ভিত্তি

বেদ ছাড়া কোনো গ্রন্থই প্রক্ষিপ্ততার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়।

একারনেই বেদ আমাদের সংস্কৃতিতে এতটা গুরুত্বপূর্ণ। বেদ সকলকিছুর ভিত্তিকে তৈরী করেছে এবং তাই যদি বেদ অপরিবর্তিত থাকে, অন্য গ্রন্থগুলো ভবিষ্যতে দার্শনিকদের দ্বারা উদ্ভুত হতে পারবে।

অন্য শাস্ত্রগ্রন্থগুলোর ব্যাখ্যা করার মানদণ্ড হলো বেদ। এই গ্রন্থগুলো ব্যাখ্যা করা হবে এবং বর্ধিতাংশ হিসেবে গৃহীত হবে শুধুমাত্র যেটা বেদের সাথে সম্মত হবে। এইটি স্মৃতিসমূহ, ব্রাহ্মণ, মহাভারত, রামায়ন, গীতা, উপনিষদ, আয়ুর্বেদ, নীতিশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি সকল গ্রন্থের জন্য সত্য।

মনু নিজে মনুস্মৃতিতে বেদকেই ধর্মের ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

মনুস্মৃতি ২/৮ একজন শিক্ষিত ব্যাক্তি জ্ঞানের দৃষ্টিতে এই সকলকে সুক্ষ্ম-ভাবে বিশ্লেষন করে, বেদের কর্তৃত্ব অনুসারে তার দায়িত্বে নিবিষ্ট হবেন।

এভাবে, এটা পরিষ্কার হয়, মনুস্মৃতিকে শুধুমাত্র বেদের ধারায় ব্যাখ্যা

করতে হবে৷

শূদ্রদের বেদ পাঠের এবং বৈদিক আচার অনুষ্ঠান পালনের অধিকার আছে

বেদ খুব স্পষ্টভাবে শূদ্রদের (এবং নারীদের) এবং অবশ্যই পুরো মানবজাতিকে বেদ পাঠ করতে ও যজ্ঞের ন্যায় বৈদিক অনুষ্ঠান পালনের অধিকার প্রদান করে - যজুর্বেদ ২৬/১, ঋগবেদ ১০/৫৩/৪, নিরুক্ত ৩/৮ ইত্যাদি৷

মনুস্মৃতিও একই বৈদিক সত্যকে সমর্থন করে৷ এজন্যে কোথাও উপনয়ন প্রসঙ্গে (শিক্ষার প্রারম্ভে) মনু শূদ্রদের জন্য উপনয়ন বা পৈতা নেওয়া নিষেধ করেননি৷ বিপরীতে, যারা শিক্ষার পৈতা নিতে অস্বীকৃতি জানাবে, তাদেরকে শূদ্র বলা হয়!

বেদের ধারার সাথে মনুও শাসককে এটা নিশ্চিত করতে আদেশ দেন যে, শূদ্রদের বেতন ভাতা যেন কখনো কোনো অবস্থাতে হ্রাস করা না হয়৷ (৭/১২৫-১২৬, ৮/২১৬)

সারসংক্ষেপ

সংক্ষেপে, মনু জন্ম-ভিত্তিক বর্ণপ্রথাকে প্রনয়ন করেছেন এই ধারনা ভিত্তিহীন৷ বিপরীতে, মনুস্মৃতি পরিবার বা জন্ম ভিত্তিতে কোনো ব্যাক্তিকে বিচার করার যেকোনো তথ্যসূত্রের তীব্রভাবে বিরোধী৷ মনুর বর্ণপ্রথা সম্পূর্ণ মেধাভিত্তিক৷

প্রত্যেক মানুষের চারটি বর্ণ আছে৷ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র৷ মনু সমাজে থাকা প্রতিটি ব্যাক্তির মধ্যে যে যে বর্ণের প্রাবল্য বেশি সে অনুযায়ী সাজাতে চেষ্টা করেছেন এমন এক উপায়ে যেটা ব্যাক্তিক ও সামষ্টিক উন্নয়নে সহায়ক হবে৷

আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে অন্য অভিযোগ— মনু শূদ্রদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছেন এবং ব্রাহ্মণদের জন্য পক্ষপাতমূলক আচরন করেছেন, এইটিকে পর্যালোচনা করব৷

কিন্তু আমরা এই অংশে উপসংহারে আসতে চাই মনু নিজে প্রতারণা ও

ভুল কর্ম সম্পর্কে কি বলেছেন।

তিনি মনুস্মৃতি ৪/৩০ এ বলেছেন, প্রতারণা, ভ্রান্তকর্ম, শঠতা, বিপথগামী-তা ও মিথ্যাকথনকে এমনকি শব্দের দ্বারাও সম্মান করা যাবে না।

জন্মের ভিত্তিতে জাতপ্রথাটা হলো সভ্য মানব সমাজে সবচেয়ে বড় ন্যা-ক্কারজনক প্রতারণা, শঠতাপূর্ণ বিকৃতি ও মিথ্যা অনুশীলন। মনু ও বেদ অনুসারে, প্রত্যেকের উচিত এই অপরাধমূলক কর্মকান্ডকে ধ্বংসে কাজ করা, সব ধরনের কঠোর শব্দে এবং শক্ত কর্মকান্ডে এ কাজ করা। জন্ম ভিত্তিক জাতিপ্রথার প্রতি এমনকি শব্দেও নরম মনোভাব পোষন করা মনু বিরোধী কাজ।

মনুস্মৃতির বিকৃত শ্লোকগুলোর ব্যাপারে কি হবে?

থামুন, থামুন অগ্নিবীর! আপনি শেষ করার আগে, আমি আপনার নিকট দাবী করছি মনুসংহিতার ওই বিকৃত শ্লোকগুলো ব্যাখ্যা করুন, যেগুলো জন্মভিত্তিক জাতিপ্রথাকে ও লিঙ্গ বৈষম্যকে সমর্থন করতে সর্বত্র উল্লে-খিত হয়। আমি মনুস্মৃতি থেকে এ ধরনের শতশত শ্লোক দিতে পারব।

অগ্নিবীর

এটাই তো মূল কথাটা বন্ধু! কিভাবে একই মনুস্মৃতিতে জন্মভিত্তিক জাতভেদ প্রথাকে সমর্থন করার ও বাতিল করার উভয় শ্লোক থাকতে পারে? এর মানে হলো মনুস্মৃতি একটি গভীর পরীক্ষার দাবী জানায়।

চলুন আমরা কিছু সংক্ষিপ্ত বিষয় পর্যালোচনা করি।

বিষয় ১: বর্তমানের মনুস্মৃতি প্রক্ষিপ্ত ও ভেজাল শ্লোকে ভর্তি, এগুলো বিভিন্ন কারনে পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছিলো। বর্তমানের মনুস্মৃতির প্রায় ৬০% ভাগ আসলে প্রক্ষিপ্ত। বাস্তবে, ১৭৯৪ সালে উইলিয়াম জোনস নামে এক ব্যাক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশ উদ্ভাবিত মনুস্মৃতির কলকাতা পাণ্ডুলিপি ছাড়া বর্তমান মনুস্মৃতির বিশুদ্ধ হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। এই সন্দে-হজনক ব্রিটিশ গ্রন্থ ছাড়া বর্তমান মনুস্মৃতির আর কোনো প্রামানিকতার প্রমাণ নেই।

বিষয় ২: বেদ ছাড়া একা শুধু মনুস্মৃতিরই এই সমস্যা নেই, বরং সকল বিশ্বাস ব্যবস্থার মধ্যেই অদলবদল, সংযোজন ও কোনো অংশ বাদ দেওয়ার প্রবনতা দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে রামায়ন, মহাভারত, বাইবেল ও কুরান ইত্যাদি। বেদই শুধুমাত্র সংরক্ষন করা হয়েছে অনন্য-সাধারন পাঠ ও স্বর প্রক্রিয়ায়। ভবিষ্যপুরানের কথা আর না বলাই ভালো, ছাপাখানা আবিষ্কার হওয়ার আগ পর্যন্ত এটা ক্রমাগত পরিবর্তন হয়েছে!

বিষয় ৩: আজকাল রামায়নের তিন ধরনের সংস্করন পাওয়া যায়। দক্ষিনা-ত্য, পশ্চিমোত্তরীয় এবং গৌড়িয়, এগুলো ভিন্ন ভিন্ন। এমনকি গীতা প্রেস গোরক্ষপুর অনেকগুলো অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বে-শিরভাগ পণ্ডিতগন একমত হয়েছেন, বালকান্ড ও উত্তরাকান্ড অত্যন্ত প্রক্ষিপ্ত পাঠ।

একইভাবে, মহাভারতও হলো অতিমাত্রায় প্রক্ষিপ্ত গ্রন্থ। গরুড় পুরাণ ব্র-হ্মাকাণ্ড ১/৫৯ বলছে, কলিযুগে অনেক প্রতারক ব্রাহ্মণ দাবী করে মহা-ভারতের কিছু শ্লোককে মুছে দেয় এবং নতুন কিছু শ্লোক মহাভারতে যুক্ত করে।

মহাভারত শান্তিপর্ব ২৬৫/৯/৪ স্বয়ং বলে, বৈদিক গ্রন্থ সুস্পষ্টভাবে মদ, মাছ ও মাংস নিষিদ্ধ করে। এগুলো প্রতারকগন প্রচলন করেছে, তারা এই ধরনের শ্লোকগুলো প্রতারনার মাধ্যমে গ্রন্থে যুক্ত করেছে।

বর্তমানে বাইবেলের আসল সংকলনটি আর নেই! আমাদের আছে কেবল আসল বাইবেল যেটা কেউ দেখেনি, সেটার অনুবাদ থেকে করা অনুবা-দগুলো।

কোরআনও দাবি করে এটি মোহাম্মদের মূল শিক্ষার একটি পরিবর্তিত সংকলন।

অবাক হওয়ার কিছু নেই, মনুস্মৃতি সামাজিক ব্যবস্থার একটি প্রাচীন গ্রন্থ, এবং এটাও পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়াও যেহেতু মনুস্মৃতি ঐতিহাসিক-ভাবে প্রতিটি নাগরিকের প্রতিদিনকার জীবনে এবং জাতির রাজনীতিতে এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। সবকিছুর পর, শত শত বছর ধরে এটা সংবিধানের মত ছিলো। তাই, মনুস্মৃতিতে অসৎ লোকেদের প্রক্ষিপ্ত অংশ

সংযোজন করার উদ্দীপনা ছিলো অত্যন্ত বেশি।

বিষয় ৪: যখন আমরা মনুস্মৃতি পর্যালোচনা করি, আমরা চার ধরনের প্রক্ষিপ্ততা পাইঃ এটাতে সম্পূর্ণতা আনতে, স্বার্থপরতার জন্য, এটাকে অতিরঞ্জিত করতে ও এতে (মনুস্মৃতিতে) ক্রুটি আনতে। এই প্রক্ষিপ্ত অংশগুলোর বেশিরভাগই নিশ্চিতভাবেই অত্যন্ত অমার্জিত। ডঃ সুরেন্দ্র কুমার হিন্দীতে মনুস্মৃতির এক বিস্তারিত অনুবাদ করেছেন যেখানে তিনি প্রতিটা শ্লোককে বিভিন্ন মাপকাঠিতে বিশ্লেষন করেছেন, যাতে নিশ্চিতভাবে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলোকে তুলে ফেলা যায়।

তিনি অনুমান করেন মনুস্মৃতির ২৬৮৫ টি শ্লোকের মধ্যে, অন্ততঃ, ১৪৭১ টি শ্লোক প্রক্ষিপ্তযুক্ত হয়েছে। তিনি এই মিশ্রনগুলোকে শ্রেণীবিন্যস্ত করেছেনঃ

- বিষয় বর্হিভুত
- প্রসঙ্গ বহির্ভুত
- পরস্পরবিরোধী
- পুনরাবৃত্তি
- ব্যবহার ও ধরনে পার্থক্য
- বেদের সাথে অমার্জনীয় অসঙ্গতি

আমরা বৈদিক গ্রন্থের আগ্রহী সকল ছাত্রদেরকে ডঃ সুরেন্দ্র কুমারের মনুস্মৃতির একটি কপি ক্রয় করার পরামর্শ দেই (বইটি প্রকাশ করেছেন আর্ষ সাহিত্য প্রচার ট্রাস্ট, দিল্লী) এটা বিষয়টিকে বাতাসের মত পরিষ্কার করে দেবে।

বিষয় ৫: ডঃ সুরেন্দ্র কুমারই একমাত্র ব্যাক্তি নন, যিনি মনুস্মৃতির এই প্রক্ষিপ্তকরনকে ধরতে পেরেছেন, অনেক পশ্চিমা ভারতত্ত্ববিদ যেমনঃ ম্যাকডোনেল, কেইথ, বুলহের ইত্যাদি একই মতামত প্রকাশ করেছেন।

বিষয় ৬: এমনকি বি আর আম্বেদকর মেনে নিয়েছেন এই প্রাচীন গ্রন্থ-

গুলো প্রক্ষিপ্ত। তিনি তো রামায়ন, মহাভারত, গীতা পুরাণ এমনকি বেদেও প্রক্ষিপ্ত থাকার অভিযোগ করেছেন। তিনি মনুস্মৃতি হতে পরস্পরবিরোধী শ্লোক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমানের দলিত কর্মীরা এটা উপেক্ষা করে।

এই দূরদৃষ্টিহীন কর্ম এক মনুবিরোধী আন্দোলনকে উত্তেজিত করে এবং অনেক রাজনীতিবিদের জন্য রাজনৈতিক ক্যারিয়ার সৃষ্টি করলো। কিন্তু এই নির্বাচনমূলক সততা শুধুমাত্র জাতি ভিত্তিক ঘৃণাকে অধিকতর খারাপ করেছে এবং নায়ক মনুকে মানুষের কাছে দূর্বত্ত হিসেবে রূপায়িত করেছে।

এমনকি তথাকথিত আর্যসমাজী সন্যাসী অগ্নিবেশ মনুস্মৃতির কপি পুড়িয়েছে এবং মহান ঋষির সম্মানহানী করেছে শুধুমাত্র নিজের রাজ-নৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য। যদিও সে ভালোভাবেই জানে স্বামী দয়ান-ন্দ স্বরস্বতী নিজেই দৃঢ়ভাবে ঘোষনা করেছেন, মনুস্মৃতিতে প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে, কিন্তু মনুস্মৃতির মূল শ্লোকগুলো তাঁর বৈদিক আদর্শের ভিত্তি।

এবং বর্তমানে লোকজন আশা করে এমন আলোকিত লোকজনই নাকি আন্না হাজারের আন্দোলনের চিন্তাশীল ব্যাক্তি হয়ে জাতির দূর্নীতি দূর করতে সহায়ক হবে! আমরা মনে হয় ইতিহাস থেকে কখনোই শিক্ষা নেব না! কিন্তু এটা ভিন্ন কথা।

উপসংহার

মনুস্মৃতি লক্ষনীয়ভাবে অপমিশ্রনের শিকার হয়েছে। যাহোক, এই মিশ্রিত শ্লোকগুলো সহজেই চিহ্নিত করা যায় ও বাতিল করা যায়। বাকী মনুস্মৃতি একটি দারুন গ্রন্থ, এটি মেধাভিত্তিক যুক্তিসম্মত সমাজ স্থাপন করে, এটা প্রতিটি ব্যাক্তিকে মূল্যায়ন করে ও সামষ্টিক উন্নতি নিশ্চিত করে।

বেদ মূল মনুস্মৃতির ভিত্তি।

বর্তমানের মনুস্মৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলনটা পুরোটাই বিশুদ্ধ রাজনৈতিক খেলা, এই খেলায় তারাই নেতৃত্ব দিচ্ছে যারা কখনোই মনুস্মৃতিকে গুরু-ত্বের সাথে পর্যালোচনা করেনি।

আসল মনুবাদ সম্পূর্ণভাবে জন্মভিত্তিক জাতপ্রথাকে খোলাখুলি বাতিল করে এবং যারা জন্মভিত্তিক বৈষম্যকে ন্যায্যতা দেয় তাদেরকে কঠিন শাস্তির ঘোষনা করে। এটা কিছু লোকের জন্য 'দলিত' শব্দটিকেও প্রত্যা-খ্যান করে, কারন তারা বাকী মানব সম্প্রদায়ের সাথে সকল দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সমান।

আসুন আমরা সকলে একটি জাতপাতহীন ও মেধাভিত্তিক সমাজের লক্ষ্যে আমাদের সমাজে এই মনুবাদ স্থাপন করতে কাজ করি।

আসুন আমরা প্রকৃত ধর্ম অনুসরন করি যেটা জাতি, জন্ম, লিঙ্গ, দেশ, ধর্ম এবং অন্যান্য ভিত্তিহীন মাপকাঠি নির্বিশেষে সকল মানবের জন্য এক।

মনুস্মৃতি ৮/১৭

মহৎ কর্ম বা ধর্মই হলো একমাত্র সখা যেটা মৃত্যুর পরও সাথী হয়। বাকী সবাই মৃত্যুর সাথে সাথেই ছেড়ে যায়।

অধ্যায় ৭
মনুস্মৃতি ও শাস্তি

এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে, আমরা মহর্ষি মনুর উপর দ্বিতীয় বহুজন বিদিত অভিযোগ, 'তিনি শূদ্রদের উপর কঠিন শাস্তির বিধান দিয়েছেন এবং উঁচু জাতের লোকেদের বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের জন্য বিশেষ ফৌজদারী সুযোগ দিয়েছেন' এইটি পর্যালোচনা করব।

আমরা ইতিমধ্যেই পূর্বের অধ্যায়গুলোতে পর্যালোচনা করেছি যে, ২,৬৮৫ শ্লোকের মধ্যে ১৪৭১ টি শ্লোক পরবর্তীতে যুক্ত। এই সকল শ্লোক-গুলো উঁচু জাতের লোকেদের বিশেষ সুযোগের এবং শূদ্রদের জন্য কঠিন শাস্তির সুপারিশ করে যেটা সহজেই শনাক্ত করা যায়।

যদি আমরা আসল মনুস্মৃতি পর্যালোচনা করি, যাহা বেদের উপর ভিত্তি করে, আমরা দেখব অবস্থাটা সম্পূর্ণ বিপরীত। মনু অনুসারে, **দণ্ড ব্যবস্থা শাস্তির সুপারিশ করার সময় বিবেচনায় নেয়, শিক্ষা, সামাজিক প্রভাব, উপাধি, অপরাধের ধরন এবং অপরাধের প্রভাব ইত্যাদি।**

মনু ব্রাহ্মণ তথা শিক্ষিত ব্যাক্তিকে এবং তার মর্যাদাকে সম্মান দেয়। দ্বিজ তথা দ্বিতীয় জন্ম বা যারা তাদের শিক্ষা শেষ করেছে তারা সমাজে উচ্চতর

মর্যাদায় আছে যতটুকু সম্ভব তারা মহৎ কর্ম সম্পাদন করে। **কিন্তু যখন সে অপরাধ করে, তারা আরো অধিকতর শাস্তির মুখোমুখি হয়।** বড় সুযোগের সাথে, বড় দায়িত্ব আসে এবং এ দায়িত্ব পালনে ব্যার্থ হলে কঠিন সাজা হয়।

(এখানে, আমি আরো একবার জোর দিতে চাই, ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ জন্মের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এটা সম্পূর্ণ শিক্ষার ব্যাপার।)

যদি কোনো জাতি শাস্তিদানের এ ধরনের বিধানকে গ্রহণ করে, দূর্নীতি ও অপরাধ থাকবে না, এবং রাজনীতি একটি ক্ষেত্র হয়ে যাবে যেখানে কোনো বড় বড় ধাপ্পাবাজ লোকেরা প্রবেশ করার সাহস করবে না এবং এখনের মত এটাকে দূষিত করতে পারবে না।

অপরাধীর শাস্তি ও সামাজিক মর্যাদা

আমরা কিছু শ্লোক তুলে ধরছি যেটা বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক।

মনুস্মৃতি ৮/৩৩৫ বাবা, মা, শিক্ষক, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র বা ব্রাহ্মণ যে কেউই অপরাধ করবে, তারা শাসক কর্তৃক শাস্তির উপযুক্ত হবে।

মনুস্মৃতি ৮/৩৩৬ যেখানে একজন সাধারন নাগরিকের জন্য শাস্তি ১ পয়সা, শাসক শ্রেণীর জন্য সেই শাস্তি হবে ১০০০ পয়সা। অন্য কথায়, যারা আইন প্রণয়ন করবে, কার্যপরিচালনায় থাকবে বা বিচারকার্যে থাকবে তার শাস্তি সাধারন নাগরিকের তুলনায় ১০০০ গুন হবে।

পার্লামেন্ট সদস্য ও বিচারকদের অভিযোগ ও আইনগত কাঠামো থেকে খালাস দেয়াটা নির্লজ্জতা এবং মনুস্মৃতির বিরোধী।

স্বামী দয়ানন্দ এখানে যুক্ত করেছেন, এমনকি একজন সরকারের কোনো বিভাগের পিওনেরও শাস্তি সাধারন মানুষের চেয়ে আটগুণ হবে। এবং অন্য সকল অফিসভৃত্যদের শাস্তি তাদের পদমর্যাদার অনুপাতে হবে, এটা উচ্চপদস্থ পদমর্যাদার ব্যাক্তির জন্য ১০০০ গুন পর্যন্ত। কারন সরকারী আধিকারিকদের শাস্তি যদি সাধারণের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভা-বে কঠিন না হয়, সরকার জনগনকে ধ্বংস করে ফেলবে। ঠিক যেমন

একটা সিংহকে আয়ত্তে আনতে কঠিন নিয়ন্ত্রন দরকার হয় কিন্তু একটা ছাগলকে আয়ত্তে আনতে কম নিয়ন্ত্রন, একইভাবে জনগনের নিরাপত্তার জন্য, সরকারী অফিসারদের অত্যন্ত কঠিন শাস্তির দরকার।

শাস্তির এই মূলনীতি থেকে সরে আসাই হলো এই সকল দূর্নীতির মূল কারন। সংশোধন করা না হলে, জাতিকে উন্নতির দিকে নেওয়ার সকল চেষ্টা ভুপতিত হবে।

মনুস্মৃতি ৮/৩৩৭-৩৩৮ যদি কেউ, অপরাধে জড়াচ্ছে এই পূর্ণ জ্ঞানে ইচ্ছাকৃতভাবে চুরি সংঘটিত করে, এক্ষেত্রে, যদি সে শূদ্র হয় সাধারন চোরের চেয়ে আটগুণ বেশি শাস্তি হবে। বৈশ্য হলে ১৬ গুণ বেশি শাস্তি হবে, ৩২ গুণ বেশি শাস্তি হবে যদি সে ক্ষত্রিয় হয় আর ৬৪ গুণ বেশি শাস্তি হবে যদি সে ব্রাহ্মণ হয়। এই শাস্তি ১০০ গুণ বা ১২৮ গুণও হতে পারে ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে। **অন্য ভাষায়, এই শাস্তি অপরাধীর জ্ঞান ও সামাজিক মর্যাদার সাথে সরাসরি সমানুপাতিক।**

সাধারন মানুষের ধারনার বিপরীতে, দেখা যাচ্ছে, যখন শাস্তির বিষয় আসে, শিক্ষার অভাব থাকায় মনুস্মৃতি শূদ্রদের উপর অনেক ক্ষমাশীল, উল্লেখজনকভাবে ব্রাহ্মণদের এবং রাজকর্মচারীদের উপর বরং কঠোর। বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, জাতীয় রাজনৈতিক দলের নেতারা কঠোর শাস্তি পাওয়ার যোগ্য যদি তারা ভুল কিছু করে থাকে। এর পরের তালিকায় আছে মন্ত্রী, এমপি, MLA, গভর্নর, বিচারকগন। এবং তারপর আসবে আমলাগন ও সরকারী কর্মকর্তারা। এবং এমনকি সরকারী অফিসের একজন পিওনও সাধারন মানুষের তুলনায় কঠিন সাজা পাওয়ার যোগ্য।

সাধারন নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষিত অংশটা এবং যাদের প্রভাব বিস্তারকারী সামাজিক মর্যাদা আছে, তাদের দায়িত্ব অবহেলার জন্য তারা কঠিন সাজা পাওয়ার যোগ্য।

যেহেতু আমরা বলি, বড় দায়িত্ব বড় শাস্তিকে নিয়ে আসে। এটাই মনুস্মৃতির আসল দণ্ড ব্যবস্থা এবং যদি জন্মভিত্তিক তথাকথিত ব্রাহ্মণরা নিশ্চিতভাবে তথাকথিত জন্মভিত্তিক দলিতদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে,

তাহলে তাদের উচিত তাদের নিজেদের জন্য কঠিন শাস্তিকে মেনে নিতে তৈরী থাকা। বেশিরভাগ জন্মভিত্তিক ব্রাহ্মণরা বেদ সম্পর্কে জানে না। এখন মনু বলেন, যে ব্রাহ্মণরা বেদ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে নিজের পরিশ্রম দেয়, তারা শূদ্র। দেখুন মনুস্মৃতি ২/১৬৮ এটা ব্রাহ্মণদের প্রতি অপমান। মনুস্মৃতির জাল শ্লোক অনুসারে, একজন ব্রাহ্মণকে এমনকি বাক্য দ্বারাও ক্ষতি করার ন্যূন্যতম অনুশোচনা হলো একদিনের জন্য ক্ষুধার্ত থাকা। (মনুস্মৃতির জাল শ্লোক ১১/২০৪ অনুসারে)। এভাবে, যারা মনুস্মৃতির জাল শ্লোক অনুসারে ব্রাহ্মণত্বের জন্ম অধিকার দাবী করে তাদের অন্ততঃ টানা ৬৪ দিন ক্ষুধার্ত থাকা উচিত, যতক্ষন তারা বেদের উপর দক্ষ না হচ্ছে এবং যেকোনো কুঅভ্যাস সহ কঠিন ভাষা ব্যবহার থেকে মুক্ত থাকছে! (ব্রাহ্মণদের জন্য শাস্তি সাধারন মানুষের শাস্তির ৬৪ থেকে ১২৮গুন)।

আপনি বলতে পারেন না "**হেড পরলে আমি জিতব আর টেইল পরলে তুমি হারবে।**" যুক্তিবাদী ও সৎ হোন, আসল মনুস্মৃতি অনুসরন করুন এবং জন্মভিত্তিক জাতপ্রথা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করুন অথবা অন্ততঃপক্ষে ৬৪ দিন অনশন করার প্রস্তুতি নিন, যতক্ষন আপনি বেদের উপর দক্ষ না হচ্ছেন!

মূল কথাটি হলো জন্মভিত্তিক জাতপ্রথা অস্পষ্টভাবেও মনুর সামাজের বিন্যাসের সাথে যায় না। যারা এটা সমর্থন করে বা জন্মভিত্তিক ব্রাহ্মণদেরকে শাস্তির ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থার সুপারিশ করে, তারা লজ্জাজনকভাবে মনু, বেদ ও সার্বিকভাবে মানবতার বিরোধী। এবং মনু অনুসারে, এমন লোকেরা যারা সমাজের ক্ষতির কারন তারা কঠিন শাস্তির যোগ্য।

শূদ্রেরা কঠিন শাস্তির যোগ্য এমন ধারনা স্রেফ ধোঁকাবাজি।

আমরা যেন সকলে মনুস্মৃতির প্রস্তাবিত দণ্ডব্যবস্থা গ্রহণ করি এবং জাতিকে দূর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ, বিচারক ও অন্যান্য কপট বুদ্ধিজীবিদের তীক্ষ্ণ নখর থেকে জাতিকে বাঁচাতে পারি।

সারমর্মঃ মনুস্মৃতি ৭/১৭-২০

- একটি শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত দণ্ড ব্যবস্থাই হলো সত্যিকারের শাসক।

• দণ্ড ন্যায়ের বর্ধনকারী।

• দণ্ডই শাসনকর্তা।

• দণ্ডই প্রশাসক।

• দণ্ড একাই চারবর্ণকে রক্ষা করে এবং জীবনের চার ধাপকে রক্ষা করে।

• দণ্ড জনগনকে রক্ষা করে, এবং দণ্ড জাতিকে সজাগ রাখে। এজন্যেই জ্ঞানী লোকেরা ঘোষনা করে দণ্ডই হলো ধর্ম।

যখন দণ্ড বিজ্ঞতা ও দায়িত্বের সাথে প্রয়োগ করা হয়, এটা জনগনের মধ্যে উন্নতি ও আনন্দ আনে। এবং যখন দণ্ড বেপরোয়া প্রয়োগ করা হয়, এটা শাসককে ধ্বংস করে দেয়।

মনে হচ্ছে এখন সময় এসেছে দূর্নীতিবাজ নেতা ও অফিসারদের ধ্বংস করার কারন তারা দণ্ডের অত্যন্ত অপব্যবহার করছে! এটাই সময় দণ্ড প্রয়োগ করার, যারা যেকোনোভাবে জন্ম ভিত্তিক বৈষম্যকে সমর্থন করে।

একমাত্র এটাই সমাজ,জাতি ও মানবতাকে রক্ষা করতে পারে।

অধ্যায় ৮

মনুস্মৃতি, জাতিভেদ ও হিন্দুদের দুঃখগাথা

প্রতিটা দলিতবাদী বুদ্ধিজীবি ভালোভাবে জানেন, যে মনুস্মৃতি তারা হিন্দু-ধর্মকে ঘৃণার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেন, সেটা আসলে ব্রিটিশ কর্তৃক সংকলিত, কোথাও আপত্তিকর পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। তারা জানে এই মনুস্মৃতি কখনো কোনো গুরুকুলে পড়ানো হয়নি। তারা জানে কোনো হিন্দু তাদের বাড়িতে এই মনস্মৃতির কোনো কপি রাখে না। তারা জানে মনুস্মৃতির উল্লেখ অনুসারে কোনো দলিতকে বিগত ১০০০০০ বছরে কানে গলিত সীসা ঢেলে হত্যা করা হয়নি।

যদিও তারা সম্পূর্ণ মিথ্যার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণার জন্ম দিয়েছে।

তুমি কি কখনো মনুস্মৃতি কোনো মন্দিরে দেখেছ? তুমি কি কখনো কাউকে দেখেছ মনুস্মৃতি পাঠ করছে? তবুও হিন্দুদের অবমাননা করতে, মনুস্মৃতিকে হিন্দুধর্মের উপর জোর করে চাপানো হয়েছে। বাস্তবতা হলো এই মনুস্মৃতি ব্রিটিশ সৃষ্টি। প্রকৃত মনুস্মৃতি জাতপাত বিরোধী। প্রকৃত মনুস্মৃ-

তি মানব ইতিহাসে লিখিত অত্যন্ত দলিত অনুকুল গ্রন্থ, এটা পরিষ্কারভাবে বলছে কর্মই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ, জাত নয়। এইটি জাতি, উপজাতি ইত্যাদির ভিত্তিতে ভাগ করার ধারণাকে বাতিল করে দেয়।

বর্তমানে দলিত অনুকুল এবং জাতপাত বিরোধী দলগুলো এই ভেজাল মনুস্মৃতি ব্যবহার করে তাদের দাবীকে যথার্থতা দিতে। জিহাদীরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের লাগিয়ে দিয়ে হাসে। তারা সকল জাতি উপজাতিকে হত্যা করে, ধর্ষন করে। আমরা ক্রমাগত বোকা হতেই থাকি। স্রেফ পাগলামী এটা, আর কিছু না।

সংক্ষেপে বিষয়গুলো

• আধুনিক মনুস্মৃতি ব্রিটিশরা তৈরী করেছে, হিন্দুরা নয়। তারা ১৭৯৪ সালে একটি কলিকাতা পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করে এবং আমাদের উপর হিন্দু আইন হিসেবে প্রয়োগ করে। কেউ জানে না কোথা থেকে এই কলিকাতা পাণ্ডুলিপি এসেছে।

• বিভিন্ন শ্লোকের সাথে অন্ততঃ ৫০টি বিভিন্ন মনুস্মৃতি পাণ্ডুলিপি আর্কাইভে আছে এবং তাদের কোনো একটিকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে বেছে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

• ব্রিটিশদের তৈরী মনুস্মৃতি যেটা কমিউনিস্টরা পুড়িয়ে থাকে, তাতে এমন কিছু শ্লোক আছে যেগুলো নারী ও নিম্ন জাতিকে মানহানি করে। হাস্যকরভাবে, এই একই মনুস্মৃতিতে প্রচুর পরিমান শ্লোক আছে যেটি জাতিভেদ প্রথাকে বিরোধীতা করে এবং নারীদের অবস্থানকে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত পুরুষের চেয়ে উঁচুতে তুলে ধরে।

• ইতিহাসে এমন কোনো শাস্তির প্রমাণ নেই, মনুস্মৃতির উপর ভিত্তি করে কাউকে শাস্তি দেয়া হয়েছে।

• ৯৯.৯৯% হিন্দুদের ঘরে মনুস্মৃতি নেই। এটা খুব কম ছাপানো হয় কারন ব্রিটিশ, কমিউনিস্ট এবং কিছু জাতপাতবাদী লোকেদের কোনো অংশেরই এটির প্রতি আগ্রহ নেই।

• যখন কমিউনিস্টদের মনুস্মৃতি পোড়াতে হয়, তারা প্রথমে ইন্টারনে-টে সার্চ দেয়, তারপর কিছু ব্রিটিশ সাইট থেকে প্রিন্টআউট নেয় এবং তারপর ওই পাতাগুলো পোড়ায়। কারন তারা এই বইটি কোনো হিন্দু ধর্মীয় স্টোর থেকে পেতে সক্ষম হয় না।

• যদি আপনার অনুমান এমন হয়, ধর্ম নারীর ও মানবাধিকার হরণ করে, তাহলে প্রধান দুই অপরাধী হবে, কোরান ও বাইবেল। বর্তমানে ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা এই কোরানিক ফতোয়ার কারনে যত সংখ্যক নর ও নারী ভুক্তভোগী/নিহত হচ্ছে বা হয়েছে সে তুলনায় জন্মগ্রহণকারী লোকজন যারা বিগত ১০,০০০ বছরে মনুস্মৃতির বৈষম্যমূলক শ্লোক কখনো শুনেনি, এমন লোকের সংখ্যা কম। বাইবেলে একই আপত্তিকর রচনাংশ আছে যেগুলো বর্ণনা করছে মধ্যযুগে ইউরোপে নারীরা বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছে। একটু গুগলে খুঁজে দেখুন আপনি এগুলো দেখতে পাবেন।

• হিন্দুরা অবশ্যই মূল মনুস্মৃতি পাঠ করুন এবং আমাদের বিষ্ময়কর ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্ববোধ করুন। এটা একটা দারুন বই বিশ্ব পাঠাগারে এর সমতূল্য খুব কম বই আছে।

• যুক্তিবাদী মুক্তমনাদের অবশ্যই মনুস্মৃতিকে নারী স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্য আন্দোলনের মাসকট করা উচিত।

• কমিউনিস্টদের মনুস্মৃতির পরিবর্তে অবশ্যই কুরান ও বাইবেল পোড়ানো উচিত যদি তারা বৈষম্যমূলক কোনো গ্রন্থ পোড়ানোর তাদের স্পৃহার প্রতি সত্যিকারের সৎ হয়। যেটি কেউই কখনো শোনে নি সেটির পরিবর্তে কোনটি অধিকতর প্রভাব বিস্তার করছে তাদের অবশ্যই সেটা দিয়ে শুরু করা উচিত।

আবারও, এখানে কিছু বিষ্ময়কর শ্লোক দেয়া হলো আসল মনুস্মৃতি থেকে।

মনুস্মৃতি ৮/৩৩৭-৩৩৮ যদি কেউ, অপরাধে জড়াচ্ছে এই পূর্ণ জ্ঞানে ইচ্ছাকৃতভাবে চুরি সংঘটিত করে, এক্ষেত্রে, যদি সে শূদ্র হয় সাধারন চোরের চেয়ে আটগুণ বেশি শাস্তি হবে। বৈশ্য হলে ১৬ গুণ বেশি শাস্তি হবে, ৩২ গুণ বেশি শাস্তি হবে যদি সে ক্ষত্রিয় হয় আর ৬৪ গুণ বেশি শাস্তি হবে যদি সে ব্রাহ্মণ হয়। এই শাস্তি ১০০ গুণ বা ১২৮ গুণও হতে পারে

ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে। অন্য ভাষায়, এই শাস্তি অপরাধীর জ্ঞান ও সামাজিক মর্যাদার সাথে সরাসরি সমানুপাতিক।

মনুস্মৃতি ১০/৬৫ ব্রাহ্মণ শূদ্র হতে পারে এবং শূদ্র ব্রাহ্মণ হতে পারে। একইভাবে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরাও তাদের বর্ণ পরিবর্তন করতে পারে।

মনুস্মৃতি ২/২৮ কাউকে ব্রাহ্মণ বলে সম্বোধন করার উপযুক্ত হবে শুধুমাত্র যদি তার শরীর বেদপাঠ, শৃঙ্খলা, হোম যজ্ঞের মাধ্যমে, দায়িত্ব, বিজ্ঞান ও ধ্যানের গবেষনার মাধ্যমে, দান ও লক্ষ্য সংক্রান্ত কাজের মাধ্যমে প্রস্তুত হয়।

মনুস্মৃতি ৯/৩৩৫ যদি একজন শূদ্র (অশিক্ষিত) একজন শিক্ষিতকে সেবা করে, ভদ্র হয়, অহং বোধ থেকে মুক্ত থাকে এবং সম্মানীয় জ্ঞানীর সহচর্যে থাকে, সে এক উন্নত জন্ম ও মর্যাদা লাভ করেছে বিবেচিত হয়।

মনুস্মৃতি ৩/৫৬ যে সমাজ নারীদের সম্মান ও মর্যাদা দান করে, সে সমাজ উন্নতি ও উচ্চমর্যাদায় সমাসীন হয়। এবং যে সমাজ নারীদের এমন উচ্চমর্যাদা প্রদান করা হয় না, সে সমাজ অন্য ক্ষেত্রে যতই মহৎকর্ম করুক তা সত্বেও সে সমাজকে দুঃখ ও ব্যার্থতার মুখোমুখি হতে হয়।

মনুস্মৃতি ৯/২৬ নারীরা পরবর্তী প্রজন্মকে জন্ম দেয়। তারা গৃহকে আলোকিত করে। তারা সৌভাগ্য ও আনন্দ বয়ে আনে। তাই নারীরা উন্নতির সমার্থক।

ভারতে আজও নারীদেরকে 'ঘরের লক্ষ্মী' বলা হয়, আর এই শ্লোকটি এই কথাটির ভিত্তি।

এবং এই মন্ত্রটি হলো মনুস্মৃতির মহান অবদান, এটি মনুস্মৃতি পোড়ানো তথাকথিত নারীবাদীদের মুখে সজোরে থাপ্পরঃ

মনুস্মৃতি ৯/১২ মহান পুরুষ (স্বামী, পিতা, পুত্র) কর্তৃক গৃহে অন্তরীন নারী তখনো অরক্ষিতা থাকে। তাই একজন নারীকে আবদ্ধ করে রাখা নিরর্থক। একজন নারী সুরক্ষিত হয় শুধুমাত্র তার নিজের সক্ষমতা ও মানসিকতার মাধ্যমে।

জাতপাত সর্বত্র

জাতপাত একটা সামাজিক সমস্যা, এটা দক্ষিন এশিয়ার সকল ধর্মে প্রভাব ফেলছে। এটা বাইবেল ও কুরানের জাতিশ্রেষ্ঠত্ববাদ এবং কাফি-রবাদের চেয়ে অনেক কম ক্ষতিকর। আজকাল, ভারতে হিন্দু সমাজের চেয়ে মুসলিম সমাজে জাত ভিত্তিক সংরক্ষন সুবিধা বেশি। প্রায় ৬০% মুসলমান UPSC ২০১৭ এ সংরক্ষিত ক্যাটাগরি থেকে নির্বাচিত হয়েছে।

যদি একজন ব্রাহ্মণ একজন তফশিলী জাতি বা তফশিলী গোত্রের লো-কেদেরকে জিহাদির চেয়ে বেশি ঘৃণা করে, এবং একজন তফশিলী জাতি বা তফশিলী গোত্রের কেউ জিহাদির চেয়ে একজন ব্রাহ্মণকে বেশি ঘৃণা করে, তাহলে উভয়েই জিহাদির লুন্ঠনের উপযুক্ত হবে, যতক্ষন না তারা ইরানের (অমুসলিমদের) ন্যায় লুপ্ত হবে।

অসংখ্য ঘটনা আছে যেখানে তথাকথিত ব্রাহ্মণরা তাদের জাতের কারনে নিষ্পেষিত হয়েছে!! সম্প্রতি তামিল নাড়ুর কিছু দুষ্কৃতিকারী তাদের Janeus ভাঙ্গছিলো। অথচ এটিকে কোনো আইনে অপরাধ হিসেবে ধরা হয়নি। কিন্তু যদি একজন ব্রাহ্মণ অভিযোগ করে বা পাল্টা আঘাত করে, দ্রাবিড় রাজনীতি তাকে গ্রেফতার করবে!!

এই দলিত বনাম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যাটির পুরোটাই হচ্ছে নির্জলা মিথ্যা, এটা বর্ত-মান সময়ে উত্থান ঘটেছে এবং তারপর বাস্তবতায় আসা শুরু হয়েছে।

হ্যা, জাতপাত বিগত দিনেও সমস্যা ছিলো। এটা আজকেও একটা সমস্যা। কিন্তু, এটা পুরো সমাজজুড়ে বিস্তৃত - শুধু ব্রাহ্মণ বা দলিত অংশেই নয়। এবং এটা এত তীব্র নয় যে, একজন দলিত বাল্মীকি সমাজ (নিম্মবর্ণের হিন্দু সমাজ) থেকে এসে রামের ছবি পোড়ানো শুরু করবে। যাদের দূর্বল সাধারণ জ্ঞান আছে তারাও অবশ্যই জানে বাল্মীকি একজন মুনি ছিলেন যিনি রামায়ন লিখেছেন।

জ্যোতিবা ফুলে থেকে আম্বেদকর পর্যন্ত প্রত্যেকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে কারা কারা দলিত এবং কারা কারা জাতিচ্যুত এটা নির্ধারন করতে। কারন একদম তর্কহীন পার্থক্য এদের মধ্যে নেই। হিন্দু সমাজ পেশা, ব্যবসা, অঞ্চল ইত্যাদির ভিত্তিতে নিজেই বিভিন্ন দল, উপদলে বিভক্ত।

এবং প্রত্যেকটা দল নিজেকে অনন্যসাধারন মনে করে।

এই দলবাজি তথাকথিত তফশীলি জাতি, তফশীলি গোত্র, পিছিয়ে পড়া জাতির মানুষের মধ্যে আরো অধিকতরভাবে বিদ্যমান - কারন তারা বিভিন্ন ধরনের দক্ষ এবং অদক্ষ ব্যবসা গ্রহণ করে। এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যেও এই দলবাজি আছে। বেদ পথ শিক্ষা দিতে গুরুকুল খোঁজার চেষ্টা তারা কখনো করেছে?

অস্পৃশ্যতা সমাজের সমস্যা। কিন্তু এটা ব্রাহ্মণ বনাম দলিতের সমস্যা নয়। অন্তপক্ষে এটা জিহাদীদের এবং তারপর ব্রিটিশদের আসার সময়ে ছিলো না। জিহাদীরা কিছু সম্প্রদায় তৈরী করে, তাদের বাড়ির টয়লেট পরিষ্কার করতে।

ব্রিটিশরা জাতভিত্তিক বিভাজন শুরু করে। এটা ছিলো এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে। এটা তথাকথিত দলিতদের মধ্যেও ছিলো। এটা খুব সম্ভব একটি স্বাস্থ্যসম্মত অনুশীলন হিসেবে শুরু হয়েছিলো। ঠিক যেমন আমরা লোকেদেরকে তাদের স্নানের আগে ছুঁই না। সমাজের অন্যান্য নির্বুদ্ধিতার ন্যায়, আমরা অস্পৃশ্যতাকে পরিস্থিতি আর সময়ভিত্তিকের পরিবর্তে দল ভিত্তিক বানিয়ে নিলাম। কিন্তু অস্পৃশ্যতা এমনকি তথাকথিত দলিত গ্রুপগুলোর মধ্যেও আছে।

এইগুলো হলো গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা, যেগুলোকে প্রত্যেকে লুকিয়ে রাখে। এই হলো বাস্তবতা - জাত পাতের বৈষম্য আর দলবাজি পুরো সমাজে ছড়িয়ে গেছে।

এটা ব্রাহ্মণ বনাম দলিত নয়। বেশিরভাগ দলগুলো জুড়ে এটা একদল বনাম অন্য দল। এইটি বেশিরভাগ দলগুলোর মধ্যে হ্রাস পাচ্ছে। এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটি হলো, এই দলবাজি বা জাতপাতের বা অস্পৃশ্যতার বিরোধীপক্ষ এসেছে তথাকথিত ব্রাহ্মণদের দিক থেকে, যাদেরকে অপরাধী বানানো হয়েছে।

• কখনো কি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর নাম শুনেছেন? তিনি মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের সমসাময়িক এবং মহাত্মা তাকে প্রশংসা করেছেন।

• কখনো কি বীর সাভারকার এর নাম শুনেছেন? তিনি হিন্দুত্ব শব্দের উদ্ভাবন করেছেন।

• কখনো ভেবেছেন কে আম্বেদকরকে তার আম্বেদকর পদবীটি দিয়েছিলেন? তিনি সারা জীবন এটি বহণ করেছেন।

আম্বেদকর নিজে হিন্দুত্ব সম্পর্কে যা বলেছেনঃ

"আমরা যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষটির উপর জোর দিতে চাচ্ছি সেটি দেবতার মূর্তির উপাসনা করে আপনি যে সন্তুষ্টি লাভ করছেন তার বিষয়ে নয়.... হিন্দুত্ব যতটা অস্পৃশ্যদের অধিকারভুক্ত ঠিক ততটাই যারা অস্পৃশ্য নয় তাদেরও অধিকারভুক্ত। এই হিন্দুত্বের বৃদ্ধি ও গৌরবে অবদান রেখেছেন অস্পৃশ্য জাতির লোকেরা যেমন, বাল্মীকি, (মহাভারতের) ব্যাধগীতার দ্রষ্টা, চোখামেলা ও রুহিদাস তেমনি অবদান রেখেছেন বশিষ্টের মত ব্রাহ্মণরা, কৃষ্ণের মত ক্ষত্রিয়রা, হর্ষের ন্যায় বৈশ্যগন এবং তুকারামের মত শূদ্রেরা।

সিদনাক মাহারের মত অসংখ্য নায়করা হিন্দুদের সুরক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছেন। মন্দির নির্মিত হয়েছে হিন্দুত্বের নামে, যে হিন্দুত্বের বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি ক্রমাগত অর্জিত হয়েছে অস্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য নয় এমন হিন্দুদের ত্যাগের জন্য, সে মন্দিরে অবশ্যই জাতপাত নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।" (বহিস্কৃত ভারত, ২৭ নভেম্বর ১৯২৭; ধনঞ্জয় কির এ উদ্‌বৃত, ডঃ আম্বেদকরঃ জীবন ও উদ্দেশ্য, ১৯৯০)

হ্যা, দলিতরা প্রচুর সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। এটা শুধু ব্রাহ্মণ, বানিয়া বা ঠাকুরদের কারনেই নয়। বরং সার্বিকভাবে সমাজের কারনে এবং সকল সম্প্রদায়ের (দলিত সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যকারই বেশি) খারাপ লোকেদের কারনে তারা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। দলিতদের জন্য লড়াইয়ে মহাত্মা ফুলের একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো। কিন্তু আধুনিক যুগে, এই কাঞ্চা চীনার মত দলিত কর্মীরা দলিতদের সমস্যার প্রধান কারন। তারা দলিতদের মূলস্রোতে যুক্ত হতে বাধা দেয়। তাদেরকে শিক্ষিত করে জাতপাতের বিরুদ্ধে জাগ্রত করার পরিবর্তে, তারা কাল্পনিক বিভেদ সৃষ্টি করে এবং যাদেরকে তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা উচিত ছিলো তাদের প্রতি

ঘৃণা করতে শেখায়।

‘সবর্ণ’ এর একক সংখ্যাগরিষ্টতা অবচেতনে হতে পারে কিন্তু অবশ্যই জাতপাতবাদী হবে না।

আমাদের বুঝার দরকার, জাতপাত একটি সামাজিক ব্যাধি, এটা পুরো সমাজকে প্রভাবিত করে। এটা উচ্চজাত বনাম নিম্নজাত নয়। এটা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম বিশেষ দলের অংশ হিসেবে নিজেকে বিবেচনা করার একটা প্রবণতা। জাতপাত প্রথা এই তথাকথিত দলিতদের মধ্যে আরো জঘন্যতম অবস্থায় বিদ্যমান আছে। এবং এটি ব্রাহ্মণদের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। অনেকে বিশেষ কিছু গ্রন্থ শুধুমাত্র বিশেষ কিছু গোত্রকে, বিশেষ কিছু গ্রামকে, এভাবে শিক্ষা দেয়। উত্তর প্রদেশে এই তথাকথিত দলিত-দের মধ্যেই আন্তঃ জাতি বিবাহ সংগঠনের চেষ্টা করুন। এটা একটা নি-খিল-সমাজ সমস্যা। যারা এটিকে একচেটিয়াভাবে উচু বনাম নিচু জাতের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে, তারা রাজনৈতিক সুবিধার জন্য এটি করে থাকে। এবং আমাকে বলতে দিন, মুসলিম সমাজ ও খ্রিস্টান সমাজ এই ব্যাপারে হিন্দুদের থেকে আরো জঘন্য, কারন তাদের মাথার উপর জা-ন্নাত-জাহান্নামের মূলো ঝোলানো থাকে। ভালো ব্যাপার হলো এটার অস্তি-ত্ব বেদে নেই।

নতুন দলিত ব্রাহ্মণরা

ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আজ দলিত হয়ে গেছে। পুজারীর কাজ তার আক-র্ষন হারিয়েছে। বেশিরভাগ ব্রাহ্মণরা গরিব। তাঁরা বঞ্চিত সংখ্যালঘু। তারা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে কারন ভারতের সকল সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোক জাতপাত প্রথায় বিশ্বাস করে এবং এমনভাবে এর ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়েছে যে, এতে করে এর দায় ব্রাহ্মণদের উপর পড়েছে। বাস্তবে জাতপা-তের বিরুদ্ধে বেশিরভাগ উচ্চকন্ঠ প্রতিবাদ এই সম্প্রদায় থেকেই এসেছে।

• আমি ব্রাহ্মণ-অপমানের বিষয়ে অত্যন্ত সমালোচনা করি এবং আমার এ ধরনের শক্তিকে ধ্বংস করার কার্যক্রম আছে।

• আমি বিশ্বাস করি জাতপাত প্রথা পুরো দক্ষিন এশিয়ার সকল ধর্ম নির্বি-শেষে সকল সমাজ জুড়েই পালিত হয়। সকল জাতি, উপজাতি, তথাক-

থিত দলিত সহ সকলেই এইটি অনুশীলন করে আর বোকার মত আঙ্গুল তুলে একটি সম্প্রদায়ের প্রতি। এই সমস্যা প্রাথমিকভাবে মুঘল এবং ব্রিটিশ আক্রমনের পরে সৃষ্টি হয়েছে। এবং সকলেই এর অংশ।

• আমার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের জন্য একটি ভালো ধারনা আছে, কারন তারা যুগ যুগ ধরে কঠোর নিয়মনিষ্টায় জীবন ধারন করে বেদ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে নিরাপদে সংরক্ষন করেছে।এমনকি সমাজ সংস্কারের প্রেরণাও স্বামী দয়ানন্দ ও বীর সাভারকারের মত ব্রাহ্মণদের দিক থেকে এসেছে।

• আমি জন্ম ভিত্তিক বর্ণ বৈষম্যে বিশ্বাস করি না। আমি এটিকে বেদের বিরোধী মানি। এই বিষয়ে আমার দর্শন সাভারকার, শ্রদ্ধানন্দ ও দয়ানন্দের কাছাকাছি।

• যারা মনে করে কেউ দলিত পরিবারে জন্ম নিলে সে আর দ্বিজ হতে পারবে না, তাদের বিরুদ্ধে আমি আমার ধারালো দৃষ্টিভঙ্গী রাখি। বর্ণ আমার পছন্দের বিষয়, এবং কে কি পড়তে পারবে, অনুশীলন করতে পারবে বা প্রার্থনা করতে পারবে এটা ঈশ্বর ও আত্মার মধ্যকার বিষয়।আমার হিন্দু ঐক্যের অনুসন্ধানে, আমি এ ধরনের ধারনা ধ্বংস করতে সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করি।

• যাহোক, আমি লোকজনকে তাদের পূর্বপুরুষের গৌরবময় কর্মের উত্ত-রাধিকার বহন করার জন্য উৎসাহিত করতেও সক্রিয়। যে কেউ অবশ্যই এমন বংশে গর্ববোধ করবে। ঠিক যেমন, একটি বংশ ধারা শুরু করতে কাউকে বাধা দিতে অবশ্যই কারো কোনো মতামত নেই।

যদি আমি উপরের দৃষ্টিভঙ্গীতে কোনো সম্প্রদায়কে আঘাত করার জন্য দোষী হই, আমি আমার দোষ ডঃ বি আর আম্বেদকরের নেতা বীর সাভা-রকার এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এর সাথে ভাগ করে নিব।

যেখানে জাতপাত প্রথা একটা নির্বুদ্ধিতা, সেখানে সকল ব্রাহ্মণকে শত্রু হিসেবে চিত্রায়িত করা আরো বড় নির্বুদ্ধিতা।

• তিনি মাধব আম্বেদকার, একজন ব্রাহ্মণ যিনি বি আর আম্বেদকরকে তার পদবী দিয়েছিলেন।

• তিনি বীর সাভারকার, একজন ব্রাহ্মণ, যিনি জাতপাত প্রথার সম্পূর্ণ অবলুপ্তির প্রস্তাব করেছিলেন, এবং গান্ধীর সাথে ঝামেলায় জড়িয়েছি-লেন।

• তিনি দয়ানন্দ স্বরস্বতী, একজন ব্রাহ্মণ, যিনি বেদ থেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, বর্ণ একটি পছন্দ, এটা জন্মভিত্তিক নয়।

• এটা ভাসি শর্মা, যিনি অগ্নিবীরের জাতপাত বিরোধী প্রকল্প পরিচালনা করছেন।

এ ধরনের অগনিত উদাহরণ আছে।

জাতপাত প্রথা ও সম্ভাব্যতার সূত্র

একজন সম্ভাব্যতার সূত্র জানা ছাত্র বুঝতে পারবে জাতপাত প্রথা কতটা ক্রুটিপূর্ণ। এখানে একটি সাধারন হিসাবঃ

• মনে করি ১০০ বছর সমান ৪ প্রজন্ম। মনে করি সভ্যতা ৩,০০০ বছর পুরোনো। তাহলে হলো ১২০ প্রজন্ম। (আমি সতর্কতার জন্য ছোটো সংখ্যা ধরেছি।)

• মনে করি কোনো ব্যাক্তির সত্য বলার সম্ভাব্যতা ৯০%। (বিগত কয়েক প্রজন্মে যে স্তরে দূর্নীতি হয়েছে তাতে মনে হয় শতকরা হারটি অত্যন্ত বেশি হয়েছে।) এখন যদি আমি দাবী করি কোনো একটি বিশেষ জাত X থেকে এসেছি। (X- ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্তজঃ ইত্যাদি), তখনই আমার দাবী সত্য হবে শুধু-মাত্র যদি আমার বংশের ১২০ জনের সকলেই সত্য কথা বলে।

ক. তাহলে, আমার জাতের সঠিক হওয়ার সম্ভাব্যতা আসলে X = (০.৯)^১২০ = ০.০০০৩২৩%। আমি যা দাবী করি আমার জাত তার থেকে ভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ৯৯.৯৯৯৬৭৭%!!!!

খ. যদি আমি মনে করি, আমি অধিকতর সৎ পরিবার থেকে এসেছি এবং আমার সৎ হওয়ার সম্ভাব্যতা বাড়িয়ে ৯৫% করুন, তাহলেও আমার

দাবীকৃত জাতিতে থাকার সম্ভাব্যতা স্রেফ ০.২১%। এবং আমার জাতি মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা ৯৯.৭৮%!!

গ. যদি আমি আরো অতি সৎ বংশ থেকে এসে থাকি এবং সততার সম্ভাব্যতা হার ৯৯% হয়, তখনো আমার দাবী করা জাতের বংশধারা সত্য হওয়ার সম্ভাব্যতা ৩০%। ৭০% ভাগ ক্ষেত্রেই আমি ভুল।

ঘ. যদি আমি ধরে নিই আমার সভ্যতা ৩,০০০ বছরের পুরোনো (আসলেই তাই), তাহলে জাতিবাদ প্রথা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা গুণিতক হারে বাড়বে। যদি আমরা ধরি, কলিযুগ ৬০০০ বছরের পুরোনো (তাহলে হবে ২৪০ প্রজন্ম, এবং সততার সম্ভাব্য হার ৯৯% হয়, তখনো আমার এই জাতপাত এর ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ৯১%।

ঙ. বিশেষ জাতিবর্ণের সাথে সংযুক্ত থাকার দাবী করলে কিছু বিশেষ অধিকার দেয়া, এবং অন্য জাতিগোষ্ঠীর সাথে সংযুক্ত থাকলে অধিকার না থাকা, এই ১২০ বা ২৪০ প্রজন্মের মধ্যে কমপক্ষে এক জনের অসৎ (বা অন্ততঃ মানসিকভাবে উন্মাদ) হওয়ার উচ্চতর সম্ভাবনা আছে। এবং এর অর্থ হলো তার পরবর্তী প্রজন্ম যে জাতগোত্রে থাকার দাবী করবে আসলে তারা সে জাতিগোত্রের না। একইভাবে, ২৪০ প্রজন্মের যে কোনো একজন অসৎ প্রভাবশালী ব্যাক্তি যেকাউকে জোর করে নিচু জাত হতে বাধ্য করতে পারে।

চ. এভাবেই, যদি জাতপাত বংশধারার সাথে যুক্ত কোনো বিষয় হয়, তাহলে সেই বংশের সম্ভাব্যতা যেমনটা অমাদের জানানো হয়েছে সেটা প্রকৃতভাবে এটা প্রায় শূণ্য হবে। আমরা যতই আমাদের সভ্যতাকে পুরাতন দাবী করব, এবং আমাদের চারপাশে যত বেশি দূর্নীতি দেখব, কোনো বিশেষ বংশধারা হতে আমাদের আসার দাবীটি ততই পরম শূণ্যের দিকে (অর্থাৎ প্রায় নেই এর দিকে) যেতে থাকবে। বিগত ৬০০০ বছরে KYC ও বায়োমেট্রিক আধার কার্ডের অনুপস্থিতিতে আমরা সকলে পরম শূণ্য, বিশ্বাস করুন।

পাদ-রেখা

জাতপাত একটা সামাজিক কুপ্রথা ছাড়া আর কিছুই না, ঈশ্বর যদি গনিত

শাস্ত্র না জেনে থাকেন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ উৎসাহিত করেন, তাহলেই কেবল তিনি এটি সৃষ্টি করতে পারেন।

সময় এসেছে এটিকে চিরতরে ধ্বংস করার, এবং সকলের শত্রু জিহাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, এটিই দলিত, অদলিত সকলকেই আক্রমণ করে আসছে ১৪০০ বছর ধরে এবং থামার কোনো লক্ষনই দেখাচ্ছে না।

৩য় অংশঃ পুরুষ সুক্তকে সঠিক-ভাবে পাওয়া

অধ্যায় ৯

পুরুষ সুক্ত বৈষম্যের উৎস

বেদ হলো জন্মভিত্তিক বর্ণ বৈষম্যের মূল উৎস। হিন্দুদের প্রাচীন গ্রন্থ বেদে এই বর্ণ প্রথার বীজ নিহিত আছে। এবং তখন থেকে বিশেষ শ্রেণীর লোকেদের প্রতি প্রতারনা করা হিন্দুধর্মের প্রধান বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। পরবর্তীতে খারাপ অবস্থার প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যেহেতু জন্ম-ভিত্তিক বর্ণপ্রথার ভিত্তি বেদে ছিলো এবং বেদই হিন্দুদের জন্য অবি-সংবাদিত কর্তৃপক্ষ, তাই সমাজ থেকে জন্মভিত্তিক বর্ণপ্রথাকে সমূলে উৎখাত করার উপায় ছিলো না।

উপরের বর্ণিত বিশ্বাস ব্যবস্থাই সম্ভবতঃ জাতপাত ব্যবস্থার উৎস সম্প-র্কিত প্রধান মন্তব্য, এটি তথাকথিত বুদ্ধিজীবি মানসিকতার বিরাট ক্ষেত্র-কে দুষিত করছে।

কারা বর্ণপ্রথার সুবিধাভোগী হচ্ছে?

অন্য ধর্মের মেধাবীরা হিন্দুধর্মকে ঘৃণা করতে এইটিকে প্রধান অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে। যারা হিন্দুধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত করার কাজে যুক্ত এবং এই তাদের এই ধর্মান্তরকে যারা ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে অথবা

এটাকে 'বৈদিক' জন্মভিত্তিক বর্ণপ্রথা হিসেবে দোষারোপ করে, তাদের পূর্বপুরুষরা একটা উপযুক্ত যুক্তি খুঁজে পায়। এভাবেই, এটা তাদের জন্য বিজয়সূচক বিবৃতি।

স্বঘোষিত ব্রাহ্মণ ও উচু জাত

বর্ণবাদী স্বঘোষিত ব্রাহ্মণ ও তথাকথিত উচু জাতের লোকেরা তাদের প্রকৃত কর্তব্য কর্ম অগ্রাহ্য করে তাদের বিশেষ 'দিব্য' অধিকারগুলোর পক্ষে বেদকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তাদের কাছে, অবশ্যই, একজন ডাক্তারের সকল ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ক্রমাগত MBBS ছাড়পত্র দেয়ার জন্য বেদ থেকে আদেশের মত আকর্ষনীয় আর কিছুই নেই, ডাক্তারের ওই প্রজন্ম আসলে প্রকৃতপক্ষে 'medicine' বানানটাও ঠিকমত উচ্চারন করতে পারে কিনা তা দেখার প্রয়োজন মনে করে না।

দলিত নেতৃবৃন্দ

দলিত নেতৃবৃন্দ সমাজে বৈষম্যকে ব্যাখ্যা করতে এবং তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডার জন্য এই ব্যাখ্যা ব্যবহার করে। কারাই বা সম্পূর্ণরূপে জাতপাতের ভিত্তিকে ধ্বংস করে পুরো ভোট ব্যাংককে নষ্ট করতে চাইবে!! আম্বেদকার স্বীকার করেছিলেন, বেদ বুঝার জন্য তার কাছে একমাত্র পথ ছিলো পশ্চিমা ভারততত্ত্ববিদদের রচনাগুলো, কারন এক্ষেত্রে তার নিজের জ্ঞান অপর্যাপ্ত ছিলো। আর্য আক্রমন তত্ত্বের মত ক্ষেত্রগুলোতে আম্বেদকর পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রবলভাবে সমালোচনা করেছিলেন!

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ

যার নামে আন্না হাজারে দূর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করে ইতিহাস তৈরী করে সেই মোহনদাস গান্ধীর মত ব্যাক্তিরাও এই রোগের লক্ষনে আক্রান্ত। তার অন্য আপাত পরিনত দর্শনগুলো থাকা সত্বেও, জন্ম ভিত্তিক বর্ণ প্রথা সম্পর্কে মোহনদাস গান্ধীর শক্ত বিশ্বাস ছিলো যে, এটি ঐশ্বরিক এবং হিন্দুধর্মের সারাংশ। জাতপ্রথার ভিত্তিটিকে মেনে নিতে অস্বীকার না করে উল্টো তিনি কিছু লোককে হরিজন নামক বিশেষ নাম দিয়ে এটিকে বৈধতা দিয়েছিলেন। তাদের প্রতি এর চেয়ে বড় অপমানকর আর কি হতে পারে? এটা যেন ঠিক আরব লুটেরাদের মত, যারা তাদের

দাসদের তথা অনারব মুসলিমদের উপর শৃঙ্খল পড়াত এবং তাদেরকে 'মাওয়ালী' বলে ডাকতো! এবং বর্তমানে তারা বলে 'মাওয়ালী' শব্দের আসলে একটা ভালো অর্থ আছে! কিন্তু এই জন্মভিত্তিক জাতি তত্ব এতটাই গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিলো যে, আফ্রিকার কালো লো-কেদেরকে 'অসভ্য উলঙ্গ কাফির' বা 'চণ্ডাল' বলে ডাকা অথবা 'মানব গোষ্ঠীর বিশুদ্ধতা' এর জন্য ডাক দেয়া, এগুলো মানবতার জন্য সেবার সমার্থক হয়ে গিয়েছিলো!

বাস্তবে, তথাকথিত শূদ্রদের জন্য 'হরিজন' শব্দটি সঠিক বলে মনে হওয়ার কারনটি হলো, নির্বোধ নব-হিন্দু জাতপাতবাদী দর্শনে শূদ্র-দের জন্য হরিভক্তি ছিলো একমাত্র আধ্যাত্মিক বিকল্প, যেহেতু তারা যেকোনো বৈদিক সাহিত্যে প্রবেশে অনধিকারী ছিলো! তাদেরকে হরিজন বলে সম্বোধন করে, যে কেউ গোঁড়ামীপূর্ণ 'উঁচু জাত, নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবি এবং এমনকি 'নিচু জাত' এদের সকলকে ভোট ব্যাংক হিসেবে উপযোগী করতে পারে। এবং অবশ্যই, এই কৌশল কাজে লেগেছিলো যদি আমরা মর্যাদা কমানোর অভিপ্রায়ের সাথে এই শব্দটির জনপ্রিয়তা পরিমাপ করি।

আমরা সমাজ ও জাতির প্রতি মোহনদাসের অবদান অস্বীকার করি না। আমরা তার কারিশমাকে (ভক্তি ও উৎসাহ তৈরী করার ক্ষমতাকে) স্বীকার করি। কিন্তু নিশ্চিত এই জাতির মধ্যে হাজারো নিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী মান-সিকতার লোক জন্ম নিয়েছে তারাও যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। এসবকি-ছুর পরেও মোহনদাস গান্ধী জাতির জন্য কাজ করেছেন দাবী করা হয়, আমরা কোনোভাবে এমন কাউকে প্রশংসা করতে পারি না যিনি জোর গলায় পৃথকীকরনকে (এটা জঘন্যতম অপরাধ) সমর্থন করেন। আমাদের স্থির বিশ্বাস হলো, জগতের এই প্রাচীনতম সভ্যতা কর্তৃক জন্ম দেয়া অন্য অনেক অনুসরনীয় ব্যাক্তিদের সম্পূর্ণরূপ উপেক্ষা করে ভারতের উপর গান্ধীকে চাপিয়ে দেয়া ও তাকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে এবং এটা একটা উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়ে করা হয়েছে, এটি ব্যাক্তিত্বগনের ও তাদের সুনির্দিষ্ট অবদানগুলোর একটি নিরপেক্ষ বিশ্লেষন করেনি। আমাদের তার (গান্ধীর) অনুগ্রহভাজন নেহেরুর দর্শনকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার দরকার নেই, যার (নেহেরুর) 'ভারতের আবিষ্কার' দর্শন পরিষ্কারভাবে তার (নেহেরুর) উদ্দেশ্য ও জ্ঞানকে প্রমাণ করে। কিন্তু এই সকলকিছু এই

অধ্যায়ের মূল বিষয় নয়।

জটিল ব্যাপারটি হলো, এমনকি তথাকথিত সংস্কারবাদী রাজনৈতিকেরাও বুদ্ধিবৃত্তিক নয় এমন নানা কারনে বৈদিক জাতপাত প্রথার গল্পের বাইরে যেতে পারেননি।

(স্বামী দয়ানন্দ ছাড়া অন্য কারো সাহস হয়নি পরিষ্কার ভাষায়, প্রমাণ ও কারন সহযোগে এটি দাবী করা, কেউই জন্মগতভাবে ব্রাহ্মণ হয় না। তথা-কথিত ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেয়া একজন মুর্খ শূদ্রেরও অধম, এবং তথা-কথিত চণ্ডালের ঘরে জন্ম নেয়া একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হয়। যারা কিছু বিশেষ জনগোষ্ঠীকে জন্মের ভিত্তিতে 'শূদ্র' বলে আসলে তারা নিজেরাই মূর্খ এবং শূদ্রেরও অধম।)

পশ্চিমা ভারততত্ত্ববিদ

অবশ্যই, পশ্চিমা ভারততত্ত্ববিদগন তথাকথিত বৈদিক বর্ণ প্রথায় একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছে যাতে করে তারা হিন্দুদের তাদের ধর্মীয় ভিত্তি থেকে দূরে রাখতে পারে। তারা জানত, বেশিরভাগ ভারতীয় বুদ্ধিজীবিরা স্রেফ তোতাপাখি, তারা সেটাই উচ্চারন করে যেটা তাদের সাদা প্রভুরা যেটা উচ্চারন করে, এবং এটাই আজ পর্যন্ত হয়ে আসছে। তাদের বড় কিছুই করতে হয়নি যখন বোকা হিন্দুরা তখনো তাদের মূলভিত্তি হিসাবে জাতপাতের পাহাড়কে উইপোকার মত দৃঢ়ভাবে আটকে ছিলো, যদিও এটা তাদের কাছে দাসত্ব ও পতন নিয়ে এসেছিলো বিগত ১,০০০ বৎসর বা এর চেয়েও বেশি সময় ধরে। সকল ব্রিটিশদের যেটা করতে হয়েছিলো তা হলো, তাদের পালিত ভারততত্ত্ববিদদের দিয়ে যোগাযোগের মাধ্যম ইংরেজী ভাষায় বেদের উপর এই বর্জ্য রচনাগুলোকে ব্যপকভাবে প্রচার করা এবং বিশ্বব্যাপী এটাকেই বেদের প্রধান দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। অবশেষে, একটি মিথ্যাকে বুদ্ধিমত্তার সাথে বাজারজাত করা হলো এবং এটা সত্য হয়ে গেল! এমনকি একটি টয়লেট ক্লিনার ভালোভাবে বিজ্ঞাপন করা গেলে এটা হয়ে যায় সফলতার পানীয়!

আমরা দেখি এখানে পরাজিত, বিজয়ী, আইনজীবি, বিচারক এবং নাটকের নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের সকলের কায়েমী স্বার্থ আছে, তারা এই

বর্ণ প্রথাকে নিশ্চিত করে এবং এর ভিত্তি হিসেবে বেদকে দোষারোপ করা চলতে থাকে ও এগিয়ে যায়।

কিন্তু অগ্নিবীর এটিকে সহ্য করতে পারে না

সময়ের সাথে কিছু মহান ব্যাক্তি এই নির্বোধ জাতপাত প্রথার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে। অগ্নিবীর তাদেরকে রোল মডেল হিসেবে অভিনন্দন জানায়। কিন্তু তারাও মূলে যেতে পারেনি এবং এই ধোঁকাবাজির ভিত্তি - 'বেদ জন্মভিত্তিক বর্ণপ্রথাকে অনুমোদন দেয়' এটি নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলতে পারেনি। তাদের প্রচেষ্ঠা ছিলো শুধুমাত্র জনগনকে তাদের নিজেদের ভিত্তি বেদ থেকে দূরে থাকতে চালিত করেছিলো এবং শত্রু শক্তিকে আরো সহায়তা করেছিলো।

যদি কেউ তোমার মাকে একজন অসভ্য মহিলা বলে ডাকে, তুমি তোমার মাকে বহিষ্কার করবে না। তার পরিবর্তে তুমি অভিযোগের সত্যতা প্রকাশ করবে, যদি এ ধরনের কোনো প্রমাণ না থাকে তোমার মা এর পক্ষে দাড়াবে এবং বিপরীতভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করবে শুধুমাত্র যখন চুড়ান্ত প্রমাণ থাকবে।

কিন্তু যারা তাদের মাকে শুরুতেই লোকের কথা শুনে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, তারা স্রেফ কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত আচরন করছে। তাদের জন্য আর কি বিশেষন ব্যাবহার করা যেতে পারে এটা পাঠকদের উপর ছেড়ে দিলাম। যাহোক, আসল বিষয়টা হলো, বেদ পুরো মানব সমাজের জন্য মাতা। এটি জ্ঞান, বিজ্ঞতা ও দিক নির্দেশনার প্রথম উৎস ঠিক যেন মাতৃদুগ্ধ। যারা তাদের মাকে অবজ্ঞা করে বা কোনো যৌক্তিক কারন ছাড়া তাকে অমর্যা-দা করে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হতে বাধ্য!

মানবতা আজকে সংকটাপন্ন হচ্ছে কারন সে মা কে অবজ্ঞা করছে। এবং আমরা এই উপমহাদেশের বাসিন্দারা অধিকতর হীনতা, বিড়ম্বনা, দুঃখে ও সমস্যায় ভুগছি কারন আমরা সাম্প্রতিক ইতিহাসে মায়ের কাছাকাছি ছিলাম কিন্তু তবু তাকে অবজ্ঞা করেছি বা এমনকি তাকে ক্ষতি করেছি। আমরা সত্যিই কঠিন সাজার যোগ্য এবং আমরা এই শাস্তিগুলো পাব!

যাহোক, এটাতে বিষ্ময় নেই, আমরা নির্বোধ হিন্দুরা একদম কাণ্ডজ্ঞান-

হীনের মত কাজ করেছি। সবশেষে, আমরা আমাদের প্রনোদনা পেয়েছি সন্দেহজনক গ্রন্থের ভ্রান্ত ও মিথ্যা গল্পসমূহ থেকে, যেগুলো রাম কর্তৃক সীতার নির্বাসন দেয়াকে এবং হরিশ্চন্দ্র তার স্ত্রীকে বিক্রয় করছে এমন বি-ষয়গুলোকে আকর্ষনীয় করেছে! এমনকি ঈশ্বর তাদেরকে সাহায্য করেন যারা তাদের নিজেদেরকে সাহায্য করার ইচ্ছা করে!

এবং ঠিক এ কারনেই স্বামী দয়ানন্দের মত কিংবদন্তীরা ও অগ্নিবীরের মত তাদের পরবর্তী প্রজন্মরা এতটা শক্তভাবে বেদের পক্ষে দাঁড়ায়। এমনকি যদি মায়ের অন্য সকল সন্তানরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বা নির্বুদ্ধিতা থেকে তাকে ক্ষতি করার বা অবজ্ঞা করার সিদ্ধান্ত নেয়, এটা আমাদের প্রত্যে-ককে কোনো সয়ংক্রিয় ঐশ্বরিক অনুমোদন দেয় না তাঁকে অবজ্ঞা করার এবং আরো বুদ্ধিহীন কর্ম করার (অনুমোদন দেয় না)। কর্ম ফলের বিধান কখনো কাউকে ছেড়ে দেয়না।

লিখে রাখুন উপরের বক্তব্যটি কোনো ধরনের আবেগীয় অতিশয়োক্তি নয়। কারন এই দর্শন, যদি গভীরে না গিয়ে বুঝা হয়, তাহলে এটা অন্ধ গোঁড়ামীর দিকে চালিত করতে পারে। কেউ হয়তো বলতে পারে কুরান বা বাইবেল তাদের মা এবং তারা এর পক্ষে দাড়াতে পারে; অন্য কেউ হয়তো বিবেচনা করতে পারে সোমালিয়ান জলদস্যুতা তাদের মা এবং আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারে। এইটি স্রেফ গোঁড়ামীর দিকেই পরিচালিত করবে।

বিপরীতে, উপরেরটি হলো যুক্তিবৃত্তির প্রক্রিয়ায় উদ্ভুত উত্তমরূপে বি-শ্লেষন করা দৃষ্টিকোন। এবং আমরা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, যদি বেদ সত্যিই অযৌক্তিক কোনো কিছুর উৎস হয়, আমরা বেদকে বাতিল করব ঠিক যেভাবে কোনো ব্যাক্তি তার গ্যাংগ্রিন আক্রান্ত অঙ্গ শরীর থেকে চিকিৎ-সার মাধ্যমে বাদ করে দেয়।

যাহোক, ধাঁধাটি সমাধানের জন্য এখনো একটি জনপ্রিয় বিষয় ব্যাখ্যা করার বাকী রয়ে গেছে। এই বিষয়টি বেদের পুরুষসুক্তে প্রকাশিত একটি নির্দিষ্ট মন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত, এই মন্ত্রটিকে জন্মভিত্তিক বর্ণ প্রথার জননী বিবেচনা হয়। পুরুষসুক্ত সম্ভবত বেদে বর্ণপ্রথার একমাত্র অভিযু-ক্ত রেফারেন্স। অন্য অভিযোগগুলো এতই দূর্বল যে এগুলোকে এমনকি বেদের নিন্দুকেরাও গুরুত্বের সাথে নেয় না। যাহোক, এই একটি (অভিযো-

গ),একই রকম ঠুনকো হওয়া সত্বেও বিষ্ময়করভাবে বলিউডের অনেক বাজে ছবির মত অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে গেছে!

এটা কিছু বিশেষ মনোযোগ পাওয়ার যোগ্যতা রাখে।

পুরুষ সুক্ত কি?

পুরুষ সুক্ত হলো বেদের ১৬ টি মন্ত্রের একটি সুক্ত, সামান্য কিছু পরিবর্তনে এটি সকল চার বেদেই পাওয়া যায়। বেদের অন্য যেকোনো বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনায় পুরুষ সুক্তের উপর সম্ভবত অনেক PhD হয়েছে। সুক্তের ১১ তম মন্ত্রটিই হলো সেটি, যেটি জন্মভিত্তিক বর্ণপ্রথার অভিযোগ বহন করছে।

মন্ত্রটিকে ব্যাখ্যা করতে এবং তাদের PhD করতে, পণ্ডিতরা বিভিন্ন ধরনের পথ অবলম্বন করেছে।

• তাদের কেউ স্রেফ এটিকে আক্ষরিক অনুবাদ করেছে।

• কেউ কেউ তাদের ব্যাকরনের পরাক্রম প্রয়োগ করেছে বর্ণপ্রথাকে সমর্থন করতে।

• অন্যরা (যারা প্রাথমিকভাবে আর্যসমাজ দ্বারা প্রভাবিত) একই পরাক্রম দেখিয়েছে এটাকে বাতিল করতে।

• অন্য অনেকে উপসংহারে এসেছে, পুরুষ সুক্ত বেদে পরবর্তীতে সংকলিত হয়েছে, কারন এটি ঋগবেদের শেষ মণ্ডলে পাওয়া গেছে। বাস্তবে তারা দাবী করে ঋগবেদের পুরো শেষ মণ্ডলটিই পরবর্তী কালে সংকলিত, এর কারন তারা এটি মনে করে তাই!! সম্ভবত শাহজাহানের আত্মা লাল কিল্লায় বাস করে, কারন আমি এমনটাই সন্দেহ করি!!

(১০ম মণ্ডল ছাড়া বেদের কোনো সংকলন নেই কেন, বা পুরুষ সুক্ত অন্যান্য বেদেও কিভাবে পাওয়া যায়, তাও অন্যান্য বেদে আবার এটা ঋগবেদের মত শেষের দিকে নয়!! এইগুলো তারা কেন ব্যাখ্যা করতে পারছে না এটা একটা ভিন্ন বিষয়)

(কখনো কখনো আমরা অনুভব করি, বিজ্ঞানসম্মত পড়াশুনার অভাব পুরো বিশ্বকে নষ্ট করেছে। অনেক লোকেরা যারা বিজ্ঞান ও গনিতকে ভুতের চেয়েও ভয় পায় তারা ইতিহাস, সাহিত্য ও গনমাধ্যমের মত ক্ষে-ত্রগুলোতে প্রধান মতামত দিয়ে থাকেন। এটা হতে পারে একজন রমিলা থাপার, একজন ওয়েন্ডী ডঙ্গার বা ম্যাক্স মুলার বা অন্য যে কারো নাম আপনি নিতে পারেন। ভাগ্য তাদেরকে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ভাবার এবং বিশ্লেষনাত্মক চিন্তায় দক্ষ হওয়ার সুযোগ দেয়নি

আমাদের স্থির মতামত, যদি আমাদেরকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচাতে হয় আমাদের এই ক্ষেত্রে পুরোদস্তুর বিজ্ঞানসম্মত ও বিশ্লেষনা-ত্মক মেধা দরকার। একটি স্বাভাবিক দক্ষতা এবং যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসার পরীক্ষা থাকতেই হবে।)

পুরুষ সুক্তে জাতপাত

পুরুষ সুক্তে ফিরে আসছি, এই হলো অভিযুক্ত মন্ত্র নাম্বার ১১।

মন্ত্রটি আক্ষরিকভাবে বলে

"ব্রাহ্মণ ছিলো তাঁর মুখ, ক্ষত্রিয় তার বাহু থেকে সৃষ্টি হয়েছে, বৈশ্য এসেছে তার ঊরু থেকে এবং শূদ্র জন্মেছে তার পা থেকে।"

শূদ্রেরা নিচু স্তরের লোক যারা তার পা থেকে জন্ম নিয়েছে এবং ব্রাহ্মণরা উঁচু যারা তার মুখ থেকে জন্ম নিয়েছে। তাই, এই মন্ত্র কোথাও না কোথাও শূদ্রদের ছোট করার এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মর্যাদা বৃদ্ধির দায়ে অভিযুক্ত।

যেমনটা আমরা পূর্বে বলেছি, আপনি এই মন্ত্রটিকে সমালোচনার দৃষ্টিতে বিশ্লেষন করলে এতে সাহিত্যের আধিক্য দেখবেন এবং পর্যাপ্ত পরিমান দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ করতে পারবেন। অনেকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে, কিভাবে এই মন্ত্র আধুনিক কালের জাতপাত প্রথাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলায় ও চিন্তার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চালিত করে।

অন্যরা প্রমাণ করার চেষ্টা করে, এই মন্ত্রটি প্রক্ষিপ্ত কারন বেদে এমন

অন্য কোনো মন্ত্র নেই যেটা বর্ণপ্রথাকে সমর্থন করতে ব্যবহার করা যায়। আমরা যেমনটা পূর্বে লক্ষ্য করেছি, আমরা সবসময়ই মাতাকে পরিত্যাগ করতে অত্যন্ত আগ্রহী, কিন্তু অভিযোগকারীকে চটাতে চাই না!

বেদের আন্তরিক সমর্থকরা এই মন্ত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের বিকল্প অর্থ বের করতে চেষ্টা করে, তারা প্রতিপাদন করতে চায়, মন্ত্রটি জন্ম ভিত্তিক বর্ণপ্রথার কথা বলে না। তারা অন্য সাহিত্য থেকে এই শব্দগুলোর বিকল্প ব্যবহারের প্রমাণ দেখায় এবং অভিযোগকে প্রতিরোধ করার প্রচেষ্ঠা চালায়।

আমি মনে করি, ক্ষেত্র নির্বিশেষে এমনকি এটিও একটি নিষ্ফল প্রচেষ্ঠা, কারন বেদ অনেকটাই বিশ্লেষনাত্মক ও অন্তদর্শনমূলক, এটি ব্যাকরন ও শব্দের ব্যুৎপত্তির সাথে সামান্যই যায়। সবকিছুর পরে, ভাষাসমূহ বেদ থেকেই উদ্ভুত হয়েছে, বিপরীতটা কিন্তু হয়নি।

(স্বামী দয়ানন্দ বিশ্লেষনাত্মক যুক্তিবিন্যাসের দক্ষতার উপর বেশ জোর দিয়েছেন। তাঁর প্রস্তাবিত শিক্ষার পাঠ্যক্রমে ছিলো, শিক্ষার প্রথম কয়েক বছরে, যখন বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা সীমিত থাকে, তখন মৌলিক বিষয়ের উপর দক্ষ হতে নিয়োজিত থাকা। এবং এর বাকীটা ছিলো প্রাথমিকভাবে বিশ্লেষনমূলক ও অর্ন্তদর্শন দক্ষতার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা। দূর্ভাগ্য-জনকভাবে, আধুনিক বৈদিক পণ্ডিতরা (দয়ানন্দের অনুসারী আর্যস-মাজ সহ) বছরের পর বছর নষ্ট করে শুধুমাত্র ব্যাকরনের পিছনে এবং এরা বিজ্ঞান ও গনিতকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে। তাদের বিশ্লেষন ক্ষমতা আশাহতভাবে সীমিত, এবং তারা বেদ থেকে গবেষনা করে নতুন অর্ন্তদৃষ্টি উৎপন্ন করতে অক্ষম। অন্যান্য সমাজতত্ব বিষয়ের মত, এই ক্ষেত্রসমূ-হে গবেষনা করলে এটি প্রাথমিকভাবে সাধারন সাহিত্যকেই প্রকাশ করে (যেটা হয়তো সার্চ ইঞ্জিন ও ডিজিটাইজেশনের আবির্ভাবের কারনে শীঘ্রই অপ্রচলিত হয়ে যায়!)

পুরুষ সুক্তের বর্ণবাদী মন্ত্রের বিশ্লেষন

আমরা আলোচনার মূল বিষয়ে ফিরে আসছি, আসুন আমরা এটাকে গভীরে কিন্তু কিছুটা যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্লেষন করি। চলুন আমরা সুখ-

পাঠ্যতার জন্য আবার অর্থটিকে পুনরায় বর্ণনা করি এবং যারা এই সুন্দর মন্ত্রটিতে বর্ণভিত্তিক বৈষম্য খুজে পান তাদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তৈরী করি।

ব্রাহ্মণ ছিলো তাঁর মুখ, ক্ষত্রিয় সৃষ্টি হয়েছে তার বাহু থেকে, বৈশ্য তার ঊরু থেকে এসেছে এবং শূদ্র তার পা থেকে জন্ম নিয়েছে।

• এই মন্ত্রটা কোথায় বলছে ব্রাহ্মণরা শ্রেষ্ঠ আর শূদ্ররা নিকৃষ্ট? বাস্তবে, যদি এই মন্ত্রের আক্ষরিক অর্থ সত্য হয়, তাহলে ব্রাহ্মণ সবচেয়ে জঘন্য আর শূদ্রেরা পবিত্রতম কারন বমি ও থুতু মুখ থেকে বের হয়। মুত্র আর মল এর পরে, মানব শরীরে এটিই সবচেয়ে ঘৃনিত বর্জ্য।

যদি একটি চেরী পায়ের উপর পরে, তুমি সেটিকে তুলে নিয়ে ধুয়ে খেতে পার। বাস্তবে, বেশিরভাগ শস্য যা আমরা খাই তা কোনো না কোনোভাবে মাটি বা পা স্পর্শ করে। কিন্তু যদি এটি কারো মুখের ভিতর যায় এবং তার লালা বা থুতুর সাথে মিশ্রন হয়, নিশ্চিতভাবে তুমি এটি ধোয়ার পরও খাবে না!

• কিভাবে কোনোকিছু পা, ঊরু, মুখ বা বাহু থেকে জন্ম নিতে পারে? এমনকি মানুষের জন্যও, প্রজনের অঙ্গ ভিন্ন। তাই এটি নিশ্চিত যে, এই মন্ত্র আসলে অন্যকিছু বুঝাচ্ছে। বোকা লোকেরাই রূপককে আক্ষরিক অর্থে নেয়।

এই যুক্তিতে, যদি একটি সন্তান তার মায়ের 'চোখের তারা হয়', এটা বুঝায়, ছেলেটি তার মায়ের চোখে তারার মত থাকে! যারা এ ধরনের উপমাকে আক্ষরিকভাবে নেয় সম্ভবত তাদেরকে পাগলা গারদে পাঠাবে।

• আধুনিক 'রক্ষনশীল' হিন্দু আদর্শও আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। বাস্তবে, বৈদিক ধর্মের ভিত্তিটি এবং এর সকল শাখা প্রশাখা অজর ও অমর আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। প্রশ্নটা হলো।

• কিভাবে 'জন্মহীন' আত্মা কোনোকিছু থেকে জন্ম নিতে পারে? এবং যদি এটি সত্য হয়, তাহলে সকল বেদ ও বৈদিক সাহিত্য মিথ্যা।

• আমাদের মৃত্যুর পর কি ঘটে? এখন এটা প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস, পরবর্তী জন্মে কর্মের উপর ভিত্তি করে যে কেউ ব্রাহ্মণ হতে শূদ্রের দিকে পরিবর্তিত হতে পারে। বাস্তবে, এটা অনায়াসলব্ধ যে, গোঁড়া 'উচ্চ বর্ণ' তথাকথিত শূদ্রদেরকে প্রস্তাব দিচ্ছে, এই জন্মে আমাদের সেবা কর এবং পরবর্তী জন্মে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্ম নিও।

যদি পরবর্তী জন্মে বর্ণান্তর সম্ভব হয়, আমাদের সিস্টেমটা সম্পর্কে বুঝা ঊচিত উচিত। তাহলে কি মৃত্যুর পর আত্মা পুরুষের পায়ের দিকে, মাথার দিকে, বাহুর দিকে বা ঊরুর দিকে যায়, রক্ত সংবহন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্য অঙ্গে স্থানান্তর হয় এবং পুনরায় জন্ম নেয়?

• তাহলে পশু ও কীটপতঙ্গ এবং পাখীদের ব্যাপারে কি হবে? কোথা থেকে তারা জন্মগ্রহণ করে এবং কিভাবে তারা ব্রাহ্মণে পরিবর্তন হয়? এটা কি বোকা বোকা শুনাচ্ছে না? যদি এর আক্ষরিক অর্থ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হয়?

• এবং যাই হোক না কেন, বৈদিক ঈশ্বর সবসময়ই নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান। প্রথম প্রশ্নটা হলো তার মুখ, বাহু এবং পা কি করে থাকতে পারে? যজুর্বেদ ৪০/৮ এটাকে দ্ব্যার্থহীন পরিশব্দে বর্ণনা করে।

• এছাড়াও, যদি আমরা ধরে নেই, পরম প্রভুর আকৃতি আছে এবং তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ হতে তিনি জন্ম দিতে সক্ষম, যেটা তিনি শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, তাহলেও কিভাবে সেটি জন্মভিত্তিক বর্ণ প্রথাকে ইঙ্গিত করে? কিভাবে কেউ এই মন্ত্র থেকে উপসংহারে আসতে পারে যে, ব্রাহ্মণ শুধুমাত্র ব্রাহ্মণের পরিবার থেকে জন্ম নিতে পারে এবং শূদ্র শূদ্রের পরিবার থেকে জন্ম নিতে পারে? কারন যেহেতু মন্ত্রটির আক্ষরিক অর্থ হলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সরাসরি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শরীর থেকে জন্ম নেয়। যদি আমরা এই মন্ত্রটির সরাসরি আক্ষরিক অর্থ সত্য হিসেবে গ্রহণ করি, তাহলে যে ব্যাক্তি মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নিচ্ছে অথচ সরাসরি ঈশ্বরের শরীর থেকে জন্ম নিচ্ছে না, সে এই চার বর্ণের কোনটি হতে পারে না। তারা অন্য কিছু হতে পারে!

• এছাড়া আরো যেটি হলো, মন্ত্রটি অতীত কালে। সর্বোচ্চ যে কেউ এটা

উপসংহারে আসতে পারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রেরা সৃষ্টির শুরুতে তৈরী হওয়া অস্বাভাবিক পুরুষের বিবিধ অঙ্গ থেকে জন্ম নিয়েছিলো। কিন্তু তাদের কেউই আর এখন পর্যন্ত টিকে নেই। আজকের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রেরা মাত্র কয়েক দশক আগে জন্ম নিয়েছেন। কিন্তু মন্ত্রের আক্ষরিক অর্থে, ইতিমধ্যে জন্ম হয়ে গেছে। এই মন্ত্র এটা বলেনি যে, ঈশ্বর ভবিষ্যতের জন্ম দানের ফ্যাক্টরী চালু রেখেছেন।

এছাড়াও, আজকের মানব সম্প্রদায়ের কেউই আসলে মায়ের গর্ভ ছাড়া অন্য কোথাও থেকে আসেনি। এই আধুনিক কালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রের দাবীদারদের কেউই কোনো বর্ণের প্রকৃত দাবীদার নয়। তারা সকলে ভুয়া দাবীদার।

যদি কেউ নারীর মুখ থেকে জন্ম নিতো, আমরা তবু কৃত্তিমভাবে কু-সংস্কারমূলক আচরন করতাম এবং দাবী করতাম "যেহেতু মাতা মহীয়ান ঈশ্বর, তাই এই নবজাতক ব্রাহ্মণ।" কিন্তু তখন পর্যন্ত, মুখ, হাত, পা ও ঊরু হতে জন্ম নেওয়াই একমাত্র একটি সপ্রমান জন্ম শর্ত তৈরী করে, তাকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলে ডাকার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য। আমাদের বাকীরা, যারা সাধারন মরনশীল মানুষ, যারা আমাদের মায়েদের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর হাত, পা ও মুখ থেকে জন্ম নেননি, এই মন্ত্রের আক্ষরিক অর্থ অনুসারে তারা সম্ভবতঃ কোনো ঈশ্বর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অন্য জগৎ থেকে আসা ভিনগ্রহী প্রাণী!

যেহেতু পৃথিবীর সকল জন্ম শুধুমাত্র মা হতেই হয়, তাই যদি আমরা অস্তিত্বশীল হই তবে সকল মহিলা যারা জন্ম দেন এই মন্ত্র অনুসারে তারা ঈশ্বর। এবং সকল মানুষ এই চার বর্ণ ছাড়া ভিন্ন কিছু। সকল নারীকে ঈশ্ব-রের ন্যায় যারা শ্রদ্ধা করেন তাদের সম্পর্কে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সেই সাথে, (এ মন্ত্র অনুসারে) যদি তারা কোনো নারীর মুখ, বাহু বা পা থেকে না আসে তারা মানুষ ছাড়া অন্যকিছু হবে।

অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে, এই মন্ত্রটির কোনো মানেই থাকে না যদি কেউ একে আক্ষরিকভাবে নেয়।

কি দুঃখের বিষয়, এ লেভেলের গর্দভ আমাদের মধ্যে শতকের পর শতক

ধরে আমাদের মধ্যে আছে, আমাদেরকে বিব্রত সামর্থহীন করেছে, এবং এখনো পর্যন্ত আমরা এই নির্বুদ্ধিতা থেকে মুক্তি পেতে অস্বীকার করছি!

এই মন্ত্রের অর্ন্তনিহীত ও স্পষ্ট অর্থ

যাহোক, যদি মন্ত্রটি অন্য মন্ত্রগুলোর প্রসঙ্গে বিশ্লেষন করা হয় এবং অধিকতর বুদ্ধিমত্তার সাথে বিশ্লেষন করা হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে সেখানের সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানের পুরো একটি শাখা এই সুক্ত থেকে আবিষ্কার করা যেতে পারে।

পাঠকগন স্বামী দয়ানন্দের লিখিত ঋগবেদ ভাষ্যভুমিকা গ্রন্থের সৃষ্টিবিষয়ক অধ্যায়টি পড়ে দেখতে পারেন, এখানে যুক্তিপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষন আছে।

যাহোক, মন্ত্রটির অন্তর্নিহিত অর্থ অত্যন্ত সরল, এটা এমনকি একজন সাধারন লোকও বুঝতে পারবে, যদি আমরা আমাদের চোখ থেকে বিদ্বেষ ও মানসিকতার চশমা স্বেচ্ছায় খুলে রাখি। এটার সঠিক অর্থ যেটা সকল অনুবাদকরা অনুবাদ করেছেনঃ

ব্রাহ্মণ তার মুখ ছিলো, ক্ষত্রিয় তার বাহু থেকে উৎপন্ন, বৈশ্যরা এসেছে ঊরু থেকে আর ক্ষত্রিয় তার পা থেকে জন্ম নিয়েছে।

একমাত্র বিষয়টি হলো, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোনো আত্মাকে বা ব্যাক্তিকে বুঝাচ্ছে না।

তারা বর্ণ বা বৈশিষ্ট্যকে বুঝাচ্ছে, এবং এটা বেছে নেয়া যায়।

এবং 'তাঁর' বলতে শুধুমাত্র মহান ঈশ্বরকে বুঝাচ্ছে না, এছাড়াও এটি যেকোনো স্বনির্ভর বাস্তুতন্ত্রকেও বুঝাচ্ছে। সেটি সমাজ, সংস্থা, ব্যাক্তিক বা বৈশ্বিক হতে পারে। সর্বোপরি, সবকিছুই পরমেশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত!

মন্ত্রটি বোঝায়, যেকোনো স্বনির্ভর বাস্তুতন্ত্র চার বর্ণ বা বৈশিষ্ট্য বা গুন বা উপাদানের সমন্বয়েই গঠিত। সেই বৈশিষ্ট্য বা গুনগুলো হলো, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ অর্থ বুদ্ধি ও জ্ঞান, ক্ষত্রিয় অর্থ শক্তি ও বীরত্ব। বৈশ্য অর্থ ব্যবস্থাপনা, ভারসাম্য, ও স্থায়িত্ব। শূদ্র অর্থ অজ্ঞতা সহ অন্যান্য

সকল গুনাবলী।

একটি ভালো নিয়ম এই চারটি উপাদানকে সবচেয়ে নিঁখুতভাবে ব্যবহার করতে পারে।

একটি সফল সমাজে প্রধান হিসেবে থাকবে বুদ্ধিজীবি বা ব্রাহ্মণরা, প্রতিরক্ষা হাত হিসেবে থাকবে যোদ্ধারা বা ক্ষত্রিয়রা, বৈশ্য বা ব্যবসায়ী ব্যবস্থাপকেরা স্থিতিশীলতা দানকারী বা অস্থিমজ্জা প্রস্তুতকারক (ফিউমার বা ঊরুর হাড় শরীরের সবচেয়ে শক্তিশালী হাড়) এবং জনগনের বাকী অংশকে ব্যবহার করা হবে সমাজের ভার বহন করা ও মৌলিক অবকাঠামো দানের জন্য।

একটি সফল কোম্পানীও নিজেকে এই অনুসারেই সাজিয়ে নেবে।

পরমেশ্বর এমনভাবে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন যে, এই চার উপাদান সুষমভাবে আছে।

মানব সন্তান হিসেবে, আমাদের মধ্যেও এই সকল চারটি গুন আছে। কিন্তু যেহেতু এগুলো বর্ণ (পছন্দ), তাই আমাদের সুযোগ আছে আমাদের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে এদের প্রভাব কমানো বাড়ানোর। খেয়াল করুন এখানে কোনো বৈশিষ্ট্যকে, হয় গ্রহণ নয় বর্জন এ ধরনের কোনো একমুখী বাছাইয়ের বিষয় নেই। চারটির সব কয়টি গুণ উপস্থিত থাকে, শুধুমাত্র তাদের অনুপাতে ভিন্ন হতে পারে।

আমাদের মস্তিষ্ক ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধিত্ব করে, যতটুকু সম্ভব এর যত্ন নিতে হবে। আমাদের শক্তিশালী বাহু থাকতে হবে নিজেদেরকে সুরক্ষিত করতে। আমাদের সুস্বাস্থ্য ও ভালো রক্ত চলাচল ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারি। এছাড়া আমাদের শক্তিশালী পদযুগলও থাকতে হবে যাতে আমরা গতিশীল থাকতে পারি।

এমন কোনো মানুষ নেই যাদের মধ্যে এই এই বৈশিষ্ট্যের উপাদানগুলো নেই। এবং এই চারটি গুণের অনুপস্থিতিতে কোনো অর্থপূর্ণ কর্মকাণ্ড সম্ভব নয়। সর্বোপরি, আমরা একটা সম্পূর্ণ সত্তা, এবং কোনো সত্তার অংশবিশেষ নই।

এমনকি যখন আমরা বেদ পাঠ করি, আমরা ব্যবহার করি—

• ব্রাহ্মণ গুণ ব্যবহার করি বেদের সারমর্ম বুঝতে।

• ক্ষত্রিয় গুণ ব্যবহার করি, যাতে আমরা শান্তিমত পাঠ করতে পারি এবং মশা বা আপদ বালাই যেন অসুবিধা সৃষ্টি করতে না পারে।

• বৈশ্য গুণ ব্যবহার করি বৈদিক গ্রন্থ ও বাতি সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে।

• শূদ্র গুণ ব্যবহার করি মূলত আসন গ্রহন করতে, বাতি জ্বালাতে এবং সফলভাবে পাঠ সম্পন্ন করার জন্য দরকারী অন্যান্য কাজগুলো সম্পন্ন করতে।

এমনকি যদি কোনো একটি বর্ণকে অবজ্ঞা করি, কাজটি সফলভাবে ও নির্বিঘ্নে শেষ করা সম্ভব হবে না।

বৌদ্ধধর্ম শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ (বুদ্ধিমত্তা) গুণের দিকে কেন্দ্রীভুত করে এবং তাই আফগানিস্তান পশ্চিম এশিয় লুটেরাদের আক্রমনে দ্বারা ধ্বংস হয়েছে। ওয়াহাবীরা কেবলমাত্র যুদ্ধবিগ্রহের দিকে মনোনিবেশ করেছে এবং এটি বিশ্বকে বিপদজনক করে তুলেছে। হিন্দুরা অতিমাত্রায় ব্যবস্থাপনা / বৈশ্য গুণের দিকে মনোনিবেশ করেছে এবং তাদের শক্তি ও সম্মান হারিয়েছে। পাকিস্তানের মত ইসলামী দেশ শূদ্রদেরকে তার জনসংখ্যা থেকে বাদ দিয়েছে তাদেরকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ব্যাপারে অবজ্ঞা করে, এবং বর্বরদের প্রাধান্যের কারনে বর্তমানে এটি একটি ব্যার্থ রাষ্ট্রের কাছাকাছি পর্যায়ে চলে এসেছে।

সমাজে, আমরা সাধারনভাবে কোনো ব্যাক্তিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র বলি তার প্রধান পেশার উপর ভিত্তি করে। যাহোক, এটা স্রেফ একটা সরল অনুমান। বাস্তবে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র গুণাবলী আছে নয়তো আমরা এক মুহূর্তের জন্যও টিকতে পারতাম না।

অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যায় আপনি পরিষ্কার দেখতে পাবেন, পুরো বর্ণ ব্যাবস্থাটি একই সাথে মন্ত্রটি খুবই সহজবোধ্য এবং সহজেই বুঝা যায়। অব-

শ্যই, ভাষার অধ্যয়ন সহ এর অধিকতর অর্ন্তদর্শন ও বিশ্লেষনের মাধ্যমে, আমরা বেদের সবচেয়ে বিষ্ময়কর সুক্তগুলোর একটি থেকে এই অতি বুদ্ধিবৃত্তিক মন্ত্র হতে আরো গভীর অর্থ আহরন করতে পারব।

সারসংক্ষেপ

এর বৃহত্তর অর্থটি সুস্পষ্ট ও অর্ন্তজ্ঞানলব্ধ, যদি মন্ত্রটিকে কোনো ধরনের পূর্বের পক্ষপাতমূলক ও পূর্বপরিকল্পিত ধারনামুক্ত হয়ে লক্ষ্য করা হয়।

• এই বিশেষ মন্ত্রটিকে আক্ষরিক অর্থে নেয়া যাবেনা, প্রতীকি অর্থ নিতে হবে।

• এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারটি বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে, এগুলো সকল মানবের মধ্যে আছে। এই চার গুণগুলোই হলো বর্ণ।

• এর অর্থ হলো, আমাদের জীবনের নানান প্রেক্ষাপটের সাথে তাল মিলিয়ে এই গুণগুলোর মাত্রা বাড়ানো কমানোর একটি সুযোগ আছে।

• শরীরের এই চারটি অঙ্গ যথাঃ মাথা/মুখ/, বাহু, ঊরু ও পা চারটি বর্ণের গুণকে প্রকাশিত করে। যদি আমরা বৈশ্যের জন্য ব্যবহৃত 'ঊরু' এর ব্যাপক অর্থ বিবেচনা করি, এটা পুরো কেন্দ্রীয় সিস্টেম অর্থাৎ পরিপাকতন্ত্র থেকে ঊরু পর্যন্ত সবটাকে ইঙ্গিত করে। বাস্তবে, অথর্ববেদের পুরুষসুক্তের মন্ত্রে, 'ঊরু' এর পরিবর্তে 'মধ্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বিষয়টিকে পরিষ্কার বুঝানোর জন্য।

• যেকোনো বাস্তুতন্ত্র যেগুলো এই চার বৈশিষ্ট্যের প্রতি ভূমিকা ও দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রদান করে বা লোকেরা এই বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে, সমাজেই হোক বা ব্যাক্তিতেই হোক, এটা সফল হতে বাধ্য। যারা মাথার জন্য পা বা পা এর জন্য মাথা ব্যবহার করতে চেষ্টা করে তারা ধ্বংস হতে বাধ্য।

এবং এটাই জন্মভিত্তিক বর্ণ প্রথায় ঘটেছে। এমনকি নির্বোধ বুদ্ধিসম্পন্ন লোককে সমাজের 'মাথা' বা 'মুখ' বানানো হয়েছিলো, স্রেফ এই কারনে যে, তারা ব্রাহ্মণের দাবীদার কোনো বিশেষ পরিবারে জন্ম নিয়েছিলো

বলে। দূর্বলেরা যোদ্ধা হয়েছিলো পারিবারিক কারনে। এবং সবচেয়ে মেধাবী লোককে দাস্য অবস্থায় থাকতে বাধ্য করা হয়েছিলো স্রেফ সে অন্য পরিবারে জন্ম নিয়েছিলো বলে। ফলশ্রুতিতে আমরা আমাদের নিজেদের ধ্বংসকে ডেকে এনেছি।

যাহোক, আমরা পরিষ্কারভাবে দেখি, কোনো ব্যাক্তিই সুস্থ মস্তিষ্কের চিন্তাভাবনাতে পুরুষ সুক্তকে কোনোভাবেই এমন কোনো অর্থে ভাষ্য রচনা করতে পারবে না যার জন্মভিত্তিক বর্ণপ্রথার সাথে দূরবর্তী সংশ্লিষ্টতাও আছে। বেদ সকল মানুষের জন্য সম্পূর্ণ মেধাভিত্তিক ও সম-সুযোগ এর পক্ষে অবস্থান নেয়।

যে সকল পিএইচডি ডিগ্রীধারীরা পুরুষ সুক্তের ১১ মন্ত্রে (জন্মভিত্তিক) বর্ণপ্রথা প্রমান করতে বা বাতিল করতে চেষ্টা করছেন এটা সম্পূর্ণ অবান্তর চেষ্টা। যারা এ ধরনের গবেষনায় লিপ্ত আছে তাদের দক্ষতার তৎপরতার প্রশিক্ষন ও পরীক্ষার প্রয়োজনের উপরই তাদের স্রেফ পুনরায় জোর দেয়া উচিত। এবং যারা অতীতে এমন ধরনের গবেষনা পরিচালনা করেছেন সেই সমস্ত তথাকথিত পণ্ডিতদের বিশ্লেষন ক্ষমতা ও যুক্তি সম্পর্কিত বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা নিয়ে উচ্চস্বরে কথা বলা উচিত।

আমরা এই বইয়ের অন্য অংশে বিশ্লেষন করেছি, বেদে জাতপাত প্রথা থাকা, লিঙ্গ বা জন্মের ভিত্তিতে বৈষম্য থাকার পুরো ধোঁকাবাজিটি বাছা বাছা কিছু ব্যাক্তির মিথ্যা উদ্ভাবন। এটা সত্য যে, ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়কালে, এমন বিকৃত আদর্শ পুরো উপমহাদেশ জুড়ে প্রভাব বিস্তার করেছিলো, এই কুপ্রভাব বিশ্বকে এবং দেশকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিলো। যাহোক, ঘটনা ঘটে গেছে বলে, ঘটনাটি ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় না। ঠিক যেকারনে অশোকের যুগে বা এমনকি রামায়ন মহাভারতের যুগে অর্থহীন কিছু ঘটনা ঘটলেও এই ঘটনাগুলো সমর্থনযোগ্য হয় না।

(একটি ভুল ধারনা হলো, প্রাচীন ভারত ছিলো বৈদিক এবং এখন আমরা হয়ে গেছি অবৈদিক। আরো একটি ভুল ধারনা হলো, পশ্চিমা বিশ্ব অবৈদিক এবং আমরা হলাম অধিকতর বৈদিক। এই সকল ধারনাগুলো অগভীর চিন্তা প্রসুত। বেদ প্রকৃতি ও জীবনের সর্বোত্তম অনুশীলন গ্রন্থ ও মৌলিক বিধানকে প্রকাশ করে। আসলে বেদের সর্বোত্তম অনুশীলন

শতভাগ যথাযথভাবে কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি, আবার একটি সমাজ বেদকে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়েছে এমনও কখনোই হয়নি। সকল কিছুই সময়ের সাথে সাথে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা লাভবান হবো যখন আমরা বৈদিক জ্ঞানকে আমাদের জীবনের প্রেক্ষাপটে গ্রহণ করতে পারব এবং দুর্দশার মুখোমুখি হব যখন আমরা অন্য কোনো প্রেক্ষাপটে বেদকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করব। আমরা কিছু কিছু বিশেষ প্রেক্ষিতে রামায়ন মহাভারতের যুগের তুলনায় অধিকতর বৈদিক। আবার কিছু প্রেক্ষিতে আমরা সেই যুগের তুলনায় পিছিয়ে আছি। একইভাবে, পশ্চিমা বিশ্ব কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন সকল মানুষকে সম্মান করা ইত্যাদিতে তারা অধিকতর বৈদিক, একইভাবে আমরাও পারিবারিক মূল্যবোধের মত বিষয়গুলোর দিক দিয়ে এগিয়ে আছি। এইটি একটি সর্বোচ্চ অনির্দিষ্ট বহুমুখী ভিন্নতাবিশিষ্ট ও গতিশীল কার্য। কিন্তু বেদ আমাদের পথ দেখায় যাতে আমরা সময়মত যেকোনো প্রদত্ত পয়েন্টে আমাদের কার্যের মূল্যকে সর্বোচ্চ করতে চেষ্টা করতে পারি।

ইতিহাস থেকে কোনো উদাহরণ দেখিয়ে বা বর্তমান যুগের কোনো উদাহরন দেখিয়ে কোনো কিছুকে বৈদিক বা অবৈদিক দাবী করাটা বেদকে বর্জন করার মতই বোকামী। একটি যথাযথ বৃত্ত বাস্তবে আঁকা সম্ভব না স্রেফ এই কারন দেখিয়ে আমরা গনিতের বৃত্তের ধারনাকে বর্জন করি না!

যা আমাদের করতে হবে সেটা হলো, বেদের সত্যিকার প্রেরণায় আমাদেরকে উন্নতির সুযোগ অন্বেষন করতে হবে। এটাই হলো আদর্শ।

এখন, এই জাতপ্রথা একটি অবৈদিক বিড়ম্বনা হয়ে গেছে, এটি আমাদেরকে যুগ যুগ ধরে অসুবিধায় ফেলছে। এটাই অন্য সকল অসুবিধা যেগুলো আমরা বিগত হাজার হাজার বছর ধরে মুখোমুখি হচ্ছি এগুলোর মূল কারন হয়ে গেছে। তাই, এই জাতপাতকে সমূলে উচ্ছেদ করার এবং মহাশান্তির আশা করার এখনি সুবর্ণ সুযোগ।

আধুনিক যুগের সামাজিক ছাঁচ, কাউকে চার বর্ণের যেকোনো একটিতে সরলভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করার ব্যবস্থাটিকে সম্পূর্ণরূপে সেকেলে করে

দিয়েছে। আমাদের একটি আধুনিক মডেল গ্রহণ করার এখনই সময়। যেখানে প্রতিটি মনুষ্যের মধ্যে চারটি সকল বর্ণই বিদ্যমান আছে, এই বর্ণ-গুলোর অনুপাত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থায় জীবনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত হয়।

এবং এই ভিত্তি, একই সাথে এর প্রণোদনা আমাদের শিকড় বেদ থেকেই সঠিকভাবে আসবে। আসুন আমরা একসাথে বেদে জাতপাত থাকার মিথ্যাটি ভেঙ্গে দেই এবং পুরুষ সুক্তের পরিচালনায় এটিকে আরো এগিয়ে নেই আমাদের সমাজ থেকে জন্ম ভিত্তিক বর্ণপ্রথার সকল চিহ্নকে ধ্বংস করতে।

উপসংহার

আমরা উপরে ব্যাখ্যা করা জাতির দৃষ্টিকোনে পুরুষ সুক্তের ১১ মন্ত্রটির ব্যাখ্যার মাধ্যমে উপসংহারে আসি।

শুধুমাত্র মেধাবীরাই আমাদের জাতির মুখ হোক।

শুধুমাত্র শক্তিশালী, ক্ষমতাবান এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারীরাই শক্তি-শালী হাত হোক এবং কর্মের মাধ্যমে আমাদের জন্য সম্মান বয়ে আনুক।

স্মার্ট, প্রশিক্ষিত ব্যবস্থাপকরা আমাদের পুরো প্রক্রিয়াটিকে পরিচালিত করুক এবং একটি ছন্দোবদ্ধ, স্বাস্থ্যকর কার্যকর নিয়ন্ত্রন কৌশল নিশ্চিত করুক। এবং ব্যবস্থাটিকে গতিশীল ও শক্তিশালী রাখার ভিত্তি দিতে ও সেবা দিতে আমরা যেন আমাদের বাকী লোকেদের ব্যবহার করতে পারি।

আমরা যেন কখনো অবুদ্ধিজীবি মানসিকতার কাউকে আমাদের মাথা না করি, দূর্বল লোকেদের আমাদের হাত না করি, অপ্রশিক্ষিত অযোগ্য-দের প্রধান নিয়ন্ত্রন ব্যাবস্থাকে দেখভাল করতে না দেই এবং আমাদের মেধাবী সম্পদকে কম উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে নষ্ট না করে দেই।

আসুন আমরা জন্ম, পরিবার, পক্ষপাতিত্ব বা দূর্নীতির মত তুচ্ছ কারনে মেধার অসামঞ্জস্যতা ও কাজের ভুমিকাকে কখনো যেন মেনে না নেই।

বস্তুগত বা আধ্যাত্মিক কোনো পেশা যেন কৃত্তিম বাধা যেমন জাতপাত বা লিঙ্গগত ভিত্তিতে কিছু নির্বাচিত লোকের জায়গীর না হয়ে যায়। এবং যদি এ ধরনের কোনো বাধা থাকে, আসুন আমরা পুরুষ সুক্তকে গ্রহণ করতে এই বাধাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেই।

জাতপাত প্রথা সকল দূর্নীতির মূল।

আসুন আমরা এটার সম্পূর্ণ ধ্বংসের জন্য কাজ করি, তত্বগতভাবে এবং অনুশীলনগত ভাবে।

নান্যপন্থা বিদ্যতে!

৪র্থ অংশঃ বেদে জাতপ্রথার কাল্প-নিক গল্প

অধ্যায় ১০
আর্য কে?

আর্য মানে হলো একজন মহান ব্যাক্তি/ভদ্রলোক। যদি কেউ ব্যবহারে, বাক্যে, কর্মে বেদের মূলনীতি মেনে চলে, সে হলো সভ্য। আর আশপাশের লোকেদের প্রতি স্নেহাসক্ত, পাপ করার জন্য প্রলুব্ধ নয়, স্বাস্থ্যসম্মত, সত্যের প্রচারক ইত্যাদি হয় তাহলে সে একজন আর্য। পুনরায়, এটি সাদা কালোর কোনো যুক্তি নয়, বরং একটি চলমান কার্য।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র

ইংরেজী হলো বৈদিক ভাষার একটি দূর্বল কাছাকাছি অর্থ প্রকাশ করতে পারে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এগুলো বর্ণের নাম বা পেশার ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস। এগুলো জন্ম ভিত্তিক কিছু নয়। শূদ্র হলো এমন একজন ব্যাক্তি যারা যথাযথভাবে শিক্ষা পায় নি এবং তাই এই পেশাগুলোর কোনো একটি গ্রহণে অসমর্থ।

যে সকল লোকেরা জ্ঞান ভিত্তিক বিষয়ে নিযুক্ত থাকে তারা ব্রাহ্মণ, যারা রাজ্য পরিচালনা বা প্রতিরক্ষা বিষয়ে নিযুক্ত থাকে তারা ক্ষত্রিয়, যারা অর্থনীতি বা অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ কর্ম করে তারা বৈশ্য এবং বাকীরা শূদ্র।

বাস্তবে, একজন ব্যাক্তিই একই সাথে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হতে পারে।

এই বর্ণগুলো বর্তমানের ব্যবহৃত পদবীর ব্যবহারের রীতির সাথে কিছু নেই। বাস্তবে, যদি আপনি রামায়ন পড়েন, মহাভারত পড়েন বা সেই সময়ের অন্য কোনো গ্রন্থ পড়েন, আপনি প্রথম নাম- মধ্য নাম- পদবীনাম এই ধরনের নামকরনের রীতি পাবেন না।

‘আর্য’ বংশপরিচয়কে বহন করে না

আর্য শব্দটি যেকোনো উপায়ে বংশপরিচয়কে বহন করে’ আমি এই তর্কের ভিত্তিকে খণ্ডন করব।

অবশ্যই, পরিবার ও বংশপরিচয় একজন ব্যাক্তির সংস্কারকে নিরূপন করতে ভুমিকা পালন করে থাকে। তারমানে এই নয় যে, কোনো বংশ পরিচয়ে অজ্ঞাত ব্যাক্তি আর্য হতে পারবে না। এই কাল্পনিক বর্ণব্যবস্থা আমাদের অবক্ষয়ের জন্য বড় কারনগুলোর একটি।

আমরা বোকার মত আমাদের সাথী ভাই ও বোনদের শূদ্র ও অচ্ছুৎ হিসেবে বাদ দিয়েছি, তাদের অজ্ঞাত বা সন্দেহজনক বংশ বা পরিবারের ভিত্তিতে আমরা এটা করেছি।

আর্যের কারো গোত্র নিয়ে কোনো মাথা ব্যাথ্যা নেই। আজকাল খুব কমই কোনো পদবী কোনো গোত্রকে প্রকাশ করে। গোত্রের শ্রেণীবিভাগ নিক-টাত্মীয়দের মধ্যে বিবাহে বাধা দিতো।

আর্য হলো একটি সভ্য ব্যাক্তি। একটি পরিবার সভ্য কিনা তার অনেকগু-লো নির্ধারন পদ্ধতির মধ্যে একটি হলো যদি পরিবারের কেউ সভ্য হয়। শূদ্র ব্রাহ্মণ হতে পারবে না, এটা বলা একটা বড় ভুল। জ্ঞানবান ব্যাক্তিই ব্রাহ্মণ। শূদ্র হলো এমন একজন যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের অভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হতে পারে নি। এমনকি একজন শূদ্রও চেষ্টার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে ব্রাহ্মণ হতে পারে।

দ্বিজ শব্দের অর্থ

দ্বিজ মানে হলো দ্বিতীয় জন্ম। জন্মের সময় সকলে শূদ্র থাকে, কিন্তু শিক্ষা গ্রহণের পর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দক্ষ মানুষরূপে নতুন জন্ম নেয়। অন্য শব্দে, শিক্ষা তাদেরকে সভ্য মানুষরূপে আরেকবার জন্ম দেয়, যারা সমাজে অবদান রাখার যোগ্য। এভাবেই, তারা দ্বিজ বা দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে। যারা শিক্ষা অর্জনে অক্ষম হয় তারা এই নবজন্ম গ্রহণের সুযোগ হারায় এবং তাই শূদ্র থেকে যায়।

সংক্ষেপে

ব্রাহ্মনের একজন অশিক্ষিত পুত্রও শূদ্র এবং যেকোনো শূদ্র জ্ঞান নিজের চেষ্টায় অর্জনের পর ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় হতে পারে। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা শূদ্রের শারীরিক জন্মের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।

অধ্যায় ১১

শূদ্র কে?

হিন্দুধর্ম সম্পর্কে একটি সাধারণ উপলব্ধি হলো, শূদ্রদের বিরুদ্ধে এর বিদ্বেষভাব আছে। বেদকে ব্রাহ্মণ্যবাদী গ্রন্থ হিসেবে দায়ী করা হয়, যার নকশা করা হয়েছে শূদ্রদের দমন করার জন্য। বেদকে জাতপাত ভিত্তিক বৈষম্যের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেটা হিন্দুধর্ম / সনাতন ধর্ম বা বৈদিক ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যের নজরদারী করে। সম্পূর্ণ দলিত অনুকুল আন্দোলনেরও গোড়া হলো এই ভিত্তিহীন ধারনা।

দূর্ভাগ্যজনকভাবে, এটি সত্য থেকে বহু দূরে। এই গ্রন্থে, আমরা নিম্নলি-খিত বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করতে বেদ থেকে এবং সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ থেকে প্রমাণ পেশ করবঃ

• চার বর্ণ ও বিশেষ করে শূদ্রের অর্থ, ম্যাকলে প্রভাবিত বুদ্ধিজীবিরা আমাদের যা বিশ্বাস করাতে চায় তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

• বৈদিক জীবন ধারায় জন্মভিত্তিক বৈষম্যের বা কোনো মনুষ্যের জন্য সুযোগ অস্বীকার করার কোনো উপাদানই নেই।

• যদি কোনো গ্রন্থ বুদ্ধিবৃত্তিকে এবং সমানাধিকারকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিপালন করে, তা হলো বেদ। এমনকি মানবাধিকারের উপর সবচেয়ে সমকালীন গ্রন্থটিও বেদের (মানবাধিকারের) কাছাকাছি নয়।

বৈদিক মন্ত্রে শূদ্র

বেদের মাধ্যমে জাতপাত রহস্য সমাধান করার পূর্বে, চলুন আমরা বেদ হতে কিছু প্রার্থনা মন্ত্র দিয়ে শুরু করি, যেগুলো শূদ্রের উল্লেখ করেছে।

যজুর্বেদ ১৮/৪৮ হে প্রভু! আমাদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের জ্ঞা-নালোক / করুণা দান কর। আমাকেও একই জ্ঞানালোক দান কর যাতে আমি সত্য দেখতে পাই।

যজুর্বেদ ২০/১৭ যাকিছু অপরাধ আমরা করেছি আমাদের গ্রাম, বন বা ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে; যাকিছু অপরাধ আমরা করেছি আমাদের অঙ্গ-প্রত্য-ঙ্গের মাধ্যমে, যাকিছু অপরাধ আমরা করেছি শূদ্র ও বৈশ্যদের বিরুদ্ধে, যাকিছু অপরাধ আমরা করেছি ধর্মের ক্ষেত্রে, দয়া করে আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের এই ধরনের প্রবণতা থেকে মুক্তি দাও।

যজুর্বেদ ২৬/২ যেভাবে আমি বেদের এই জ্ঞান দান করেছি সকল মানুষের কল্যানের জন্য, একইভাবে, তোমরা সকলেও এইটি প্রচার কর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও বৈশ্য, নারী এবং এমনকি নিপীড়িত সকলের কল্যাণের জন্য। পণ্দিত এবং ধনী লোকেরা নিশ্চিত করবে যে তারা যেন আমার বার্তা থেকে পথভ্রষ্ট না হয়।

অথর্ববেদ ১৯/৩২/৮ হে প্রভু! আমি যেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও বৈশ্য সকলের ভালোবাসা প্রাপ্ত হই। আমি যেন প্রত্যেকের প্রশংসা লাভ করি।

অথর্ববেদ ১৯/৬২/১ সকল সভ্য লোকেরা যেন আমাকে শ্রদ্ধা করে। রাজাগন ও ক্ষত্রিয়গন আমাকে শ্রদ্ধা করুক। সকলে আমাকে প্রশংসার চোখে দেখুক। শূদ্র ও বৈশ্যগণ আমাকে সম্মান করুক।

এই মন্ত্রগুলো হতে এটা পরিষ্কার যে, একজন বৈদিক ব্যাক্তিঃ

• শূদ্রসহ সকলের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য ক্ষমা চায়।

• শূদ্রসহ সকলের নিকট বেদের প্রচার করতে চায়।

• ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকল বর্ণকে সমান বিবেচনা করে এবং তাদেরকে সমানভাবে সম্মান করে।

এটা পরিষ্কার যে, বেদ অনুসারে শূদ্ররাও অন্য বর্ণসমূহের ন্যায় সমান সম্মানের যোগ্য। এছাড়াও, বৈদিক প্রার্থনা অনুসারে, শূদ্রদের বড় সম্মান প্রদান করা হয়েছে।

এটাও আশ্চর্যজনক যে, এই সকল মন্ত্রে শূদ্র শব্দটি বৈশ্যের পূর্বে এসেছে। সুতরাং, কেউ পাল্টা যুক্তি দিতে পারবে না, শূদ্রদের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে বা কম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে

উপসংহারে আসতে এইগুলোই যথেষ্ট প্রমাণ যে, বেদ অনুসারে শূদ্র বলতে, জাত বা সম্প্রদায় যাদেরকে বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে, তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছুকে ইঙ্গিত করে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে শূদ্র ও এ সম্পর্কিত পরিভাষা যেমন দাস, দস্যু ও অনার্য যেগুলোকে প্রায়ই সমার্থক শব্দের সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়, সেগুলোর অর্থ প্রকাশ করব।

অধ্যায় ১২

দস্যু কে?

ম্যাকলে ব্র্যাণ্ডের শিক্ষায় বেদের সম্পর্কে একটি প্রভাবশালী বিষয় ছেয়ে আছে তা হলো, বেদ মূলত আর্য ও দস্যুদের মধ্যকার সংগ্রামের একটি বর্ণনা। এই তত্ত্বটি অর্ধশিক্ষিত পশ্চিমা ভারততত্ত্ববিদদের নিকট খুবই জনপ্রিয়, তারা একটি সৃষ্টিশীল গল্পের জাল বুনেছেঃ

"আর্যরা ছিলো বর্বর প্রবৃত্তির যাযাবর গোত্র। তারা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসেছিলো এবং ধর্ষন ও লুটতরাজ ছড়িয়ে দিয়েছিলো। ভারতের আদিবাসীদেরকে বলা হতো 'দস্যু' বা 'দাস'। তাদের উপর বিজয় অর্জ-নের পর, তারা জন্ম ভিত্তিক বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে তাদের আর্য প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। এবং আজ, অধিকাংশ লোক মনে করে, জন্মভি-ত্তিক বৈষম্য দ্বারা প্রধানত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই হিন্দুধর্ম বা সনাতনধর্ম বা বৈদিক ধর্মটির উৎস নিহীত আছে দস্যু বা দাসদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাথে।"

এটা একটা লজ্জা যে, এই তত্ত্বটি আমাদের বিপুল সংখ্যক ভাই বোনদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরী করলো, তারা নিজেদের অনার্য বলে বিবেচনা করে এবং যারা বেদ অনুসরন করে তাদের প্রতি আক্রোশপূর্ণ মনোভাব

বহন করে। এদের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত আছে যারা বর্তমানে নিজেদেরকে দলিত বা দ্রাবিড় বলে সম্বোধন করে।

পণ্ডিতরা নির্বোধ তত্ব "আর্য আক্রমন তত্ব" টিকে উদঘাটন করতে ইতি-মধ্যে প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন এর কোনো অস্তিত্ব নেই। এমনকি ডঃ আম্বেদকরের মত ব্যাক্তি যাকে দলিত আন্দোলনের পিতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় তিনি নিজেই এই তত্বের তীব্র সমালোচক ছিলেন একই সাথে দস্যুর দমনের রূপকথারও তীব্র সমালোচক ছিলেন।

বৈদিক মন্ত্রে দস্যু

যাহোক, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হলো বেদ প্রকৃতপক্ষে আর্য ও দস্যুদের সম্পর্কে কি বলেছে তা পরীক্ষা করা। সর্বোপরি, আর্য কর্তৃক দস্যু বা দাস দলন তত্বের মূল প্রমাণ হিসেবে বেদকে ধরে নেয়া হয়।

চলুন আমরা কিছু অভিযোগ পর্যালোচনা করি।

অভিযোগঃ বেদ কিছু জায়গায় আর্য ও দস্যুর বর্ণনা করেছে। অনেক-গুলো মন্ত্র দস্যুদের ধ্বংস করার জন্য ও তাদের সম্পদ লুট করার জন্য আহবান জানায়। কিছু মন্ত্র বর্ণনা করে, এমনকি নারীদেরকেও ছাড়া উচিত নয় যদি তারা দস্যু হয়। তাই, যে কেউ উপসংহারে আসতে পারে বেদ দস্যু জনতার উপর নৃশংস আর্য আক্রমণ বর্ণনা করে।

সর্বমোট, ঋগবেদে ৮৫ টা মন্ত্রে দস্যুর উল্লেখ আছে। একই সাথে কিছু মন্ত্রে সমার্থক শব্দ দাসেরও উল্লেখ আছে।

খণ্ডনঃ চলুন আমরা কিছু মন্ত্র পর্যালোচনা করি আর দেখি তারা কি বোঝাচ্ছে।

ঋগবেদ ১/৩৩/৪ হে সর্বশক্তিমান যোদ্ধা! তুমি বিভিন্ন প্রকার শক্তি অধিকারী কর এবং একাকী চল। তোমার শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহার কর সম্পদশালী দস্যু (অপরাধীদের) ও শনকা (যারা অন্যের সম্পদ চুরি করে) দের ধ্বংস করতে। তারা যেন তোমার অস্ত্রে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। এই শনকাগণ সৎ কর্মবিহীন।

দস্যুর জন্য যে বিশেষনটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো 'অযজ্ব'। এর অর্থ হলো যে মহৎ কর্ম অনুষ্ঠান করে না বা মহৎ সংকল্প করে না। নিশ্চিতভা- বে, এমন লোকেরা অপরাধী হয়। একজন রাজাকে উপদেশ দেয়া হয়েছে তাঁর নিজের লোকেদের নিরাপত্তার জন্য এ ধরনের অপরাধীদের ধ্বংস করতে।

সায়ন দস্যু বলতে চোরকে বুঝিয়েছেন। দস্যু শব্দটির উৎপত্তি 'দাস' শব্দ থেকে, যার অর্থ 'উপক্ষ্য' বা যেটি ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। তাই, দস্যু শব্দটি ঐ সকল লোকেদের চিহ্নিত করে যারা ধ্বংসাত্মক বা অপরাধী। এটা কোনো জাতি জনগোষ্ঠীকে উল্লেখ করে না।

ঋগবেদ ১/৩৩/৫ সেই দস্যুগন (অপরাধীরা) যারা নিজেরা মহৎ সংকল্প বর্জিত এবং সভ্য লোকেদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে, তোমার প্রতির- ক্ষার কারনে তারা পালিয়ে যায়। হে সাহসী যোদ্ধা, তুমি অব্রতদের (বিবে- কহীনদের) সকল দিক থেকে ধ্বংস করেছ।

এই মন্ত্রে, দস্যুর জন্য দুইটি বিশেষন ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হলো অযজ্ব (যারা মহৎ কর্ম ও মহৎ সংকল্প অনুষ্ঠান করে না) এবং অব্রত (বিশৃঙ্খল ও বিবেকহীন)

খুব স্পষ্টভাবে, দস্যু বলতে অপরাধীদের বুঝানো হয়, এবং তাদেরকে বেদে সেই ধরনের আচরন করার কথাই বলা হয়েছে, বর্তমান সভ্য সমাজে তারা যে ধরনের আচরন পাওয়ার যোগ্য।

ঋগবেদ ১/৩৩/৭ হে সাহসী যোদ্ধা! তারা হাসুক বা ক্রন্দন করুক, এই দস্যুদের ধ্বংস কর তাদেরকে পৃথিবী থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাও, এবং যারা মহান ব্রত করে এবং যারা প্রার্থনা করে তাদেরকে রক্ষা কর।

ঋগবেদ ১/৫১/৫ হে সাহসী যোদ্ধা! তোমার কৌশলের মাধ্যমে সেই ধূর্ত লোকেদেরকে ভয়ে প্রকম্পিত করাও, যারা কেবল নিজের জন্যই সকল কিছু ব্যবহার করে। হে মনুষ্যগনের রক্ষক! যারা সহিংসতা ছড়ায় সেই দস্যুগনের আবাসস্থল ধ্বংস করে দাও, এবং সাধারন ও সত্যবাদী লোকেদের রক্ষা কর।

এই মন্ত্রে, দস্যু বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা কেবল নিজেরা ভোগ করে এবং দান করা ও অন্যকে সহায়তা করা থেকে দূরে থাকে।

কৌশিতকী ব্রাহ্মণে, এমন লোকদেরকে অসুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অসুর ও দস্যু, দুটিই অপরাধীদের বোঝায়, এরা কোনো জাতিগোষ্ঠী বা গোত্রকে বোঝায় না।

ঋগবেদ ১/৫১/৬ হে সাহসী যোদ্ধা! যারা অন্যদের প্রতারিত করে তুমি তাদেরকে হত্যা করছ এবং সাধুদের রক্ষা করছ। যারা অন্যদের সহায়তা করে তাদেরকে রক্ষা করতে, তুমি শক্তিশালী দুষ্ট লোকেদেরকে পদদলিত কর। তুমি সদা দস্যু (অপরাধীদের) ধ্বংস করতে জন্ম গ্রহণ করে থাক।

দস্যুর জন্য যে বিশেষনটি ব্যবহার হয়েছে তা হলো 'শুষ্ণ', এর অর্থ হলো যারা অন্যদের শোষন করে।

ঋগবেদ ১/৫১/৭ হে ঈশ্বর! তুমি আর্য ও দস্যুদের ভালোভাবে জানো। যজ্ঞ কর্ম (মহান কর্ম) সম্পাদকদের জন্য তুমি অব্রত (অবিবেকীদের) দস্যু-দের ধ্বংস কর। আমি সকল মহান কর্ম অনুসরন করতে চাই। দয়া করে আমাকে অনুপ্রেরনা দান কর।

ঋগবেদ ১/৫/৯ হে শক্তিমান যোদ্ধা! যারা মহান ব্রতের অধিকারী এবং মহান কর্ম সম্পাদন করে সেই সকল সুশৃঙ্খল জনতার নিমিত্তে, তুমি অব্রতদের ধ্বংস কর। সেই ভদ্রভাষী লোকেদের জন্য, তুমি সেই রূঢ় ও বিশৃঙ্খল লোকেদের নিয়ন্ত্রনে আন।

ঋগবেদ ১/১১৭/২১ হে শক্তিমান যোদ্ধা! তুমি ভদ্র জনগনকে পৃষ্ঠপোষন কর এবং দস্যুদের ধ্বংস কর। এই মন্ত্রে, "আর্য" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যারা গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত আছে তাদেরকে বোঝাতে।

ঋগবেদ ১/১৩০/৮ হে শক্তিমান যোদ্ধা! তুমি তিন ধরনের যুদ্ধে লিপ্ত, সাধারন যুদ্ধ, প্রতিযোগীতামূলক আর অগ্রগতিমূলক। তুমি যজমান আর্য-দের (যারা হিতৈষী কর্ম সম্পাদন করে) রক্ষক এবং অব্রতদের ধ্বংসকারী, এই অব্রতগন তমসাচ্ছন্ন এবং হিংস্রতায় লিপ্ত বা হিংস্র কর্মকাণ্ডে লিপ্ত।

এখানে 'কৃষ্ণত্বক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এই শব্দটিকে হিন্দু ঘৃনাজীবিরা ভ্রান্তভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে, তারা এর অর্থ করে কালো চামড়ার লোক। যাহোক, গূঢ় অর্থে এর মানে হলো 'কালো বহিরাবরন'। এই মন্ত্রে 'ততৃষাণ' ও 'আর্শাসানম' উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে, এটা সব ধরনের সন্দেহ দূর করে দেয়। এর অর্থ "হত্যা করতে আগ্রহী" বা "হত্যার সাথে সংযুক্ত" বিপরীতে, 'আর্য' শব্দটি সদাশয় ব্যাক্তিদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

কোনো সন্দেহ নেই, আর্য অর্থ সভ্য লোক এবং কোনো জাতিগোষ্ঠীর সাথে এর কিছু নেই।

ঋগবেদ ৩/৩৪/৯ আর্যগনের সুরক্ষিত থাকা এবং দস্যুদের ধ্বংস হওয়া উচিত।

বর্ণ আর্যদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। বর্ণ অর্থ "গ্রহণযোগ্য" এবং আর্যবর্ণ অর্থ যিনি আর্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

ঋগবেদ ৪/২৬/২ আমি আর্যকে ভুমি দান করেছি, দানশীলকে বৃষ্টি দান করেছি এবং একই সাথে লোকেদেরকে অন্যান্য সম্পদ দান করেছি।

অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে, এখানে মহানুভবতার সাথে একই লাইনে আর্য হলো একটি বিশেষন।

একইভাবে, যে কেউ নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলো পড়তে পারেঃ

ঋগবেদ ৪/৩০/১৮

ঋগবেদ ৫/৩৪/৬

ঋগবেদ ৬/১৮/৩

ঋগবেদ ৬/২২/১০

ঋগবেদ ৬/২৫/২

ঋগবেদ ৬/৩৩/৩

ঋগবেদ ৬/৬০/৬

ঋগবেদ ৭/৫/৭

ঋগবেদ ৭/১৮/৭

ঋগবেদ ৮/২৪/২৭

ঋগবেদ ৮/১০৩/১

ঋগবেদ ১০/৩৮/৩

ঋগবেদ ১০/৪৩/৪

ঋগবেদ ১০/৪০/৩

ঋগবেদ ১০/৬৯/৬

এই সকল মন্ত্রগুলো পরিষ্কার বর্ণনা করে, সভ্য, হিতৈষী ও শান্তিপূর্ণ লোকেদের জন্য আর্য একটা বিশেষন। অপরদিকে দস্যু/দাস অপরাধ প্রবন বিবেকবর্জিত লোকেদেরকে নির্দেশ করে। এই মন্ত্রগুলোতে আর্য ও দস্যু/দাস এর পাশাপাশি ব্যবহৃত বিশেষনগুলো হতে এই সত্যটির পর্যাপ্ত প্রমান আছে।

বাস্তবিকপক্ষে, ঋগবেদ ৬/২২/১০ বর্ণনা করছে, 'দাস' দের 'আর্য' কর।

কিভাবে দাসদের 'আর্য' করা সম্ভব, যদি দাস, আর্য এগুলো কোনো জাতিগোষ্ঠীকে নির্দেশ করে থাকে?

ঋগবেদ ৬/৬০/৬ এমনকি যারা একসময় আর্য ছিলো অথচ এখন অপরাধ কার্যক্রমে লিপ্ত হয়েছে, তাদেরকেও ধ্বংস করতে হবে। একই মনোভাব ঋগবেদ ১০/৬৯/৬ এবং ১০/৮৩/১ মন্ত্রে বার বার এসেছে। এমনকি আর্য শব্দটিও স্থায়ী বিশেষন নয়। প্রত্যেকের নিরলসভাবে এটি অর্জন করতে হবে, নতুবা ঐতিহাসিকভাবে বা অভ্যাসগতভাবে যারা দস্যু তাদের মত সেও একই শাস্তিযোগ্য হবে।

অথর্ববেদ ৫/১১/৩ দাস হোক বা আর্য কেউই সর্বশক্তিমান কর্তৃক সৃষ্টির বিধানকে অমান্য করতে পারে না।

সন্দেহঃ এই মন্ত্রকে বিকৃত করার সন্দেহবাদী প্রচেষ্টা থাকতে পারে, তারা দাবী করতে পারে এই মন্ত্র পরিষ্কারভাবে দাস ও আর্য শব্দটি উল্লেখ করেছে যেটা দুটি ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর দিকেই ইঙ্গীত করছে। কারন যদি দাস শব্দের অর্থ অপরাধী হয়, তাহলে কেন ঈশ্বর তাদেরকে অপরাধ করতে দিচ্ছে, যেহেতু এই মন্ত্র বর্ণনা করছে কেউই তাঁর বিধান অমান্য করতে পারে না!!

ব্যাখ্যাঃ ঈশ্বরের বিধানে, কারো স্বাধীন ইচ্ছার উপর নিয়ন্ত্রন থাকাকে বোঝায় না। মানব শরীরে আত্মার স্বাধীন ইচ্ছা আছে এবং সে অপরাধকর্মে বা মহান কর্মে তার স্বাধীন ইচ্ছায় লিপ্ত হতে পারে। এই স্বাধীনতাও ঈশ্বরের বিধান। যাহোক, কেউই তার কর্মের ফলাফল থেকে রেহাই পেতে পারে না, এবং এটিই এই মন্ত্রে জোড় দেয়া হয়েছে।

একই সুক্তের পরবর্তী দুইটি মন্ত্র-অথর্ববেদ ৫/১১/৪ এবং অথর্ববেদ ৫/১১/৬ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করেছে। তারা বর্ণনা করে, এমনকি দূর্বৃত্তরাও ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় বিধানকে ভয় পায়। যাহোক, তারা নিয়মিত মানুষকে বিরক্ত করছে কারন তারা মানুষকে ভয় পায় না। তাই, ভক্তরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, এই দূর্বৃত্ত অপরাধীদের যেন দমন হয়, এবং পণ্ডিতদের যেন উন্নতিবিধান করা হয়।

লক্ষ্য করুন, দূর্বৃত্তদের উল্লেখ করার জন্য দাস বা দস্যু এই শব্দ দুটোই শুধু নয়। অনেক মন্ত্রে "ব্রহ্মদ্বেষ" শব্দটি উল্লেখ আছে,এর অর্থ হলো যারা অনুতাপকে, জ্ঞান ও মহৎকর্মকে ঘৃণা করে।

উদাহরণস্বরূপ, ঋগবেদ ৩/৩০/১৭ এবং ৭/১০৪/২ প্রার্থনা করে, ব্রহ্মদ্বেষ, নরখাদক, বিপদজনক ও দোষী লোকেদের বিরুদ্ধে সবসময় যুদ্ধ করতে হবে যাতে তাদেরকে নিয়ন্ত্রন করা যায়। এখন ঠিক যেমন নরখাদক, বিপদগনক ও দূর্নীতিগ্রস্থ লোকেরা যেমন একটা জাতিগোষ্ঠী হতে পারে না, (অর্থাৎ একটা জাতির সব লোক যেমন খারাপ হতে পারে না)। একইভাবে, দাস, দস্যু, ও ব্রহ্মদ্বেষ গনও কোনো জাতি হতে পারে না। এই শব্দগুলো কিছু নির্দিষ্ট লোকের অপরাধ প্রকৃতিকে নির্দেশ করে।

ঋগবেদ ৭/৮৩/৭ এই মন্ত্র এটি আরো পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করে, এমনকি দশজন অপরাধ প্রবন রাজা একজন নীতিবান রাজাকে পরাস্ত করতে পারে না, কারন মহৎ লোকেদের প্রার্থনা সত্য হয় এবং অনেক শক্তিমান ও সম্পদশালী অংশীদার এমন মহৎ ব্যাক্তির মিশনের সাথে যুক্ত থাকে।

পুনরায়, অপরাধীদের জন্য 'অযজ্ব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে পূর্বে আলোচিত মন্ত্রগুলোর কোথাও কোথাও দস্যুর সাথে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এটা খুব দুঃখের বিষয়, অনেক অর্ধ-শিক্ষিত পক্ষপাতদুষ্ট পশ্চিমা ভার-ততত্ববিদগন এই মন্ত্রে দশ রাজার মধ্যকার যুদ্ধ প্রমাণ করতে চেয়েছে!!

সংক্ষেপে

আমি ঋগবেদের আরেকটি অতি সুন্দর মন্ত্রের সাথে শেষ করব, এই মন্ত্র-টি আর্য বনাম দাস/দস্যু/অব্রত/অযজ্ব যুদ্ধের পুরো বিষয়টিকে সংক্ষেপ করে।

ঋগবেদ ৭/১০৪/১২ এই মন্ত্রটি ঘোষনা করে, একজন জ্ঞানীর জানা উচিত সৎ ও অসৎ প্রতিযোগীতা করে। সত্য মিথ্যাকে ধ্বংস করতে আগ্রসর হয় এবং মিথ্যা সত্যকে। একমাত্র সৎ ও ঋত সর্বশক্তিমান কর্তৃক সুরক্ষিত হয়।

আমরা যেন সকল মিথ্যা অহংবোধ ধ্বংস করতে পারি এবং সৎ ও ঋতের যোদ্ধা হতে পারি।

পরের অধ্যায়ে আমরা দাস শব্দটিকে আলোচনা করব এবং এর সাথে শূদ্রের কোনো যোগাযোগ নেই। এটা বরং দস্যু শব্দের একটা সমার্থক শব্দ।

১৩ অধ্যায়

দাস কে?

একটি সাধারন উপলব্ধি হলো, দাস শূদ্রের একটি সমার্থক শব্দ এবং বেদ এই দাসদের দমন করার কথা বলে।

বৈদিক মন্ত্রে দাস শব্দটি 'ক্রিয়াপদ' হিসেবে

চলুন আমরা 'দাস' শব্দটি বিভিন্নভাবে আছে এমন কিছু বৈদিক মন্ত্র পরীক্ষা করি এবং দেখি এটি ঠিক কি বোঝাচ্ছে।

ঋগবেদ ৭/১/২১ আমাদের মহান যোদ্ধারা যেন দাস বা ধ্বংস না হয়ে যায়।

ঋগবেদ ৬/৫/৪ যে লুকিয়ে থেকে আমাদেরকে বিপদে ফেলে, সে (অভি-দাসত) ধ্বংস হয়ে যাক। এখানে দাস শব্দটি ক্রিয়াবাচক শব্দ রূপে এসেছে, এর অর্থ হলো "ধ্বংসের যোগ্য"

ঋগবেদ ৭/১০৪/৭ যে আমাদেরকে ঘৃণার সাথে (অভিদাসতি) ধ্বংস করতে চায় সে কখনো উপকৃত না হোক।

ঋগবেদ ১/৯৭/২৩ আমাদের শত্রুরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক যারা আমাদের

(অভিদাসতি) ধ্বংস করতে চায়।

এই সকল মন্ত্রগুলোতে, 'দাস' শব্দটি ধ্বংস বুঝাচ্ছে।

'দস' ধাতু

অনেক মন্ত্র 'দস' ধাতুমূলের সাথে দাসের ভিন্ন ধরনের গঠন ব্যবহার করে।

ঋগবেদ ১০/১১৭/২ একজন দানশীল ব্যাক্তির সম্পদ কখনো ধ্বংস না হয় (উপদাসতি)।

ঋগবেদ ৫/৫৪/৭ পরম প্রভুর দ্বারা অনুপ্রাণিত ব্যাক্তির সম্পদ ও উন্নতি কখনো ধ্বংস হয় না।

এই মন্ত্রগুলোতে, আবার 'দাস' শব্দটি ধ্বংস হওয়া বুঝায়।

তাই এখানে পরিষ্কার, 'দাস' অর্থ ধ্বংস বুঝায় কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠী বুঝায় না।

বৈদিক মন্ত্রে বিশেষ্য হিসেবে 'দাস'

এবার আসুন আমরা কিছু মন্ত্রকে পর্যালোচনা করি যেগুলোতে 'দাস' শব্দটি সরাসরি আছে।

ঋগবেব ২/১২/৪ দাস লোকেদের বা ধ্বংসাত্মক লোকেদের ধ্বংস করা উচিত।

ঋগবেব ৫/৩৪/৬ আর্যদের উচিত দাস বা ধ্বংসাত্মক ব্যাক্তিকে নিয়ন্ত্রন করা।

ঋগবেদ ৬/২৬/৫ সেই দাস, যারা শান্তি নষ্ট করে, তাদের ধ্বংস করা উচিত। এখানে 'শম্বর' বিশেষনটি দাসের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হলো শান্তি বা শাম এর বিরোধী।

ঋগবেদ ৭/১৯/২ দাস, শুষ্ণং (লুটেরা) ও কুযবং (সন্ত্রাসী) দেরকে সম্পূ-র্ণরূপে নিয়ন্ত্রন কর।

ঋগবেদ ১০/৪৯/৬ পাপমূর্তি দাসদেরকে ধ্বংস করা উচিত।

ঋগবেদ ১০/১৯/৭ যারা হত্যা হওয়ার যোগ্য সেই দাস, তাদেরকে ধ্বংস করা উচিত।

একইভাবে, ঋগবেদ ৪/৩০/১৫, ঋগবেদ ৪/৩০/২১ এবং ঋগবেদ ৩/১২/৬ দাসদের ধ্বংস করার কথা বলে।

সারমর্ম

এটা পরিষ্কার যে, দাস সেই ব্যাক্তিকে বুঝায় যার ধ্বংসাত্মক প্রবণতা আছে, যারা যেকোনো সভ্য সমাজে ধ্বংস হওয়ার যোগ্য। সকল সন্ত্রাসী-রাই দাস। পুরো বেদে শূদ্র দাস হয়েছে এমন কোনো রেফারেন্স নেই। এটা খুব দুঃখের বিষয়, আমরা ইতিহাসের গতিপথে বেদের আসল বার্তাটা ভুলে গেছি এবং আক্ষরিকভাবে শূদ্র ও দাসের অর্থ অদলবদল করে ফেলেছি। বর্তমানে, শূদ্রকে একটি আপত্তিকর শব্দ মনে করা হয় যেখানে দাস বোঝায় হীনাবস্থাকে।

বেদ থেকে কোনোকিছুই দূরে থাকতে পারে না

যেভাবে ইউরোপীয়রা অস্ট্রেলিয়ায় দণ্ডপ্রাপ্তদের পাঠাতো, তারপর এটা নিজেই একটা জাতি হয়ে উঠলো, এই দাস শব্দের ভুল ব্যাখ্যাটা সম্ভবত সেভাবেই হয়েছে। ঠিক একইভাবে, যখন অপরাধীদের পাকড়াও করা হতো, তাদেরকে বিভিন্ন কাজে লাগানো হলো। তারপর সময়ের গতিপথে এই দাস বা তাদের পরবর্তী বংশধরদেরকেও দাস বলা হতে লাগলো। পর-বর্তীতে 'দাস' শব্দটি চাকর বা অধীনস্থ হিসেবে বুঝ হতে লাগলো।

একই রকমভাবে 'আর্য' নিজেদেরকে 'হিন্দু' বলে ডাকা শুরু করলো, এই 'হিন্দু' শব্দটির কোনো অস্তিত্বই নেই কোনো স্বীকৃত গ্রন্থে। বাস্তবে, দাস হলো দস্যু বা অপরাধীর সমার্থক শব্দ। শূদ্র হলো আর্যদের বা যে লোকেরা কল্যানময় কাজে লিপ্ত তাদের একটি পেশাভিত্তিক শাখা। ঋগবেদে ৩৬ টি মন্ত্র আছে যেখানে 'আর্য' শব্দটি বিভিন্ন গঠনে আছে এবং সব ক্ষেত্রেই এটি মহান ও নীতিবান লোকেদেরকেই বোঝাচ্ছে। শূদ্রসহ জগতের সকল ভদ্র নাগরিকই আর্য!

অধ্যায় ১৪

রাক্ষস কে?

আরেকটি কাল্পনিক গল্প পরিশ্রুত করা হয়েছে, আর্যরা আদিবাসীদের রাক্ষস বলে সম্বোধন করতো এবং তাদেরকে হত্যা করতো। রাক্ষস শব্দ-টিকে দস্যু বা দাস এর সমার্থক শব্দ বিবেচনা করা হয়, যারা কিনা আর্য লুটের শিকার হয়েছে। যাহোক এটা সত্য থেকে খুব বেশি দূরে নয় যে, রাক্ষস অর্থগতভাবে দস্যু বা দাস শব্দের কাছাকাছি, রাক্ষসদেরকে কোনো জাতিগোষ্ঠী ভাবাটা অধিকতর কল্পনাপ্রসূত।

বৈদিক মন্ত্রে রাক্ষস

আমরা ইতিমধ্যেই দাস বা দস্যু কোনো জনগোষ্ঠী হওয়ার গালগল্প খণ্ডন করেছি এবং প্রমাণ করেছি, দাস বা দস্যু অর্থ অপরাধী যাদের ধ্বংসাত্মক প্রবণতা আছে।

এই অধ্যায়ে, চলুন আমরা রাক্ষসের অর্থ মূল্যায়ন করি এবং দেখি কেন বেদ রাক্ষসদের হত্যার কথা বলে এমনকি যদি সে নারীও হয়।

ঋগবেদ ৭/১০৪/২৪ হে যোদ্ধা! তোমার উচিত পুরুষ রাক্ষস আর নারী রাক্ষসদের হত্যা করা, এরা শঠতার সাথে হত্যা করে। এই ধরনের রাক্ষসরা

যেন ভোরের সূর্য না দেখে।

তাদেরকে যতুধন (যারা মানব বসতীতে হামলা করে) এবং ক্রাব্যধ (নর-খাদক) নামে আখ্যায়িত করা হয়।

ঋগবেদ ৭/১০৪/১৭ একজন নারী রাক্ষসী, যে পেঁচার ন্যায় রাত্রে হত্যার উদ্দেশ্যে নির্গত হয়, তাকে অন্য রাক্ষসীদের সাথে ধ্বংস করা উচিত।

ঋগবেদ ৭/১০৪/১৮ হে শক্তিমান! তোমার উচিত, গনমানুষকে রক্ষা করতে এবং রাক্ষসদেরকে আটক করতে উঠে দাঁড়নো, তার হত্যার উদ্দেশ্য আছে এবং রাত্রে শান্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্য আছে।

ঋগবেদ ৭/১০৪/২১ রাজা রাক্ষসদের ধ্বংস করবে, যারা অন্যদের হত্যা করে এবং শান্তিপূর্ণ কর্মকাণ্ড ধ্বংস করে।

ঋগবেদ ৭/১০৪/২২ রাক্ষসদের ধ্বংস কর, তারা পেঁচার মত, শিকারী কুকুরের মত, শৃগাল, ঈগলের মত আক্রমন করে।

এটা পরিষ্কার, রাক্ষস বলতে কুখ্যাত সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের বুঝায় যারা শান্তিপূর্ণ সমাজের জন্য বিপদজনক। এ ধরণের লোকেদের হত্যা করতে কোনো নারী পুরুষ বিবেচনা করা উচিত নয়।

এটিকে অধিকতর পরিষ্কার করতে, নিচের মন্ত্রগুলো উল্লেখ করছি।

ঋগবেদ ৭/১০৪/১৫ যদি আমি যতুধন হই, (যারা মানব বসতিতে আক্র-মন করে) বা কোনো মানুষের জীবনকে হ্রাস করি তবে আমিও যেন নিহত হই। কিন্তু যদি আমি তা না হই, তবে যারা আমাকে মিথ্যাভাবে যতুধন হিসেবে নাম জড়িয়েছে তারা ধ্বংস হোক।

ঋগবেদ ৭/১০৪/১৬ যারা আমাকে যতুধন না হওয়া সত্ত্বেও যতুধন বা রাক্ষস বলে সম্বোধন করে এবং যারা রাক্ষসের সহিত থেকেও নিজেদের নির্দোষ দাবী করে, তারা উভয়ে ধ্বংস হোক। এমনকি রাক্ষস বা সন্ত্রা-সীদের নিরব সমর্থকেরা ধ্বংস হোক। এবং এ ধরনের সন্ত্রাসীদের জন্য, কোনো অজুহাতে তাদের প্রতি দয়া দেখানো উচিত নয়।

সংক্ষেপে

অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে, বেদ কোনো জাতিগোষ্ঠী বা গোত্রের উল্লেখ করে না, তার পরিবর্তে সন্ত্রাসবাদী শক্তি ও এদের সমর্থকদের ধ্বংসের জন্য ডাক দেয়। বেদের এই সকল প্রার্থনা বাস্তবে পরিনত হোক, এবং ISIS এর মত জগতের সকল রাক্ষস ও তাদের সমর্থকদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হোক।

অধ্যায় ১৫

বেদে শ্রমের মর্যাদা

পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আমরা দাস, দস্যু ও রাক্ষসের আসল অর্থ আলোচনা করেছি এবং উপসংহারে এসেছি, এগুলো কোনো জাতিগো-ষ্ঠীকে বোঝায় না, বরং অপরাধীদের বোঝায়। তাই বেদ তাদেরকে ধ্বংসের আহবান জানায়। দাস, দস্যু বা রাক্ষসের আসল অর্থ প্রকাশ হয়ে যাওয়ায়, কমিউনিস্ট ও ভারততত্ত্ববিদদের কায়েমী স্বার্থে আর্য আক্রমন তত্ত্বের ধাপ্পাবাজির সাথে ছড়ানো গালগল্পকে খণ্ডন করেছে ও আর্যরা কিভাবে আদিবাসীদেরকে দস্যু বা দাস বলে অভিহিত করতো এবং পরবর্তীতে তাদেরকে দাস বা শূদ্র বানানো হয়েছে, এই গল্পগুলোর খণ্ডন করেছে। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি বেদ দস্যুদের ব্যাপারে সমালোচক, কিন্তু শূদ্র-দেরকে অতি উচ্চ সম্মান দান করে এবং তাদের কল্যানের জন্য আহবান করে।

বৈদিক বর্ণ ব্যবস্থার বিস্তারিত পরীক্ষার পূর্বে, আসুন আমরা আলোচনা করি বেদ শ্রমের মর্যাদার ব্যাপারে কি বলে।

বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের চাকুরী নিম্নবর্ণের লোকেদের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়। প্রচুর পরিমান পরিশ্রম সাধ্য কাজ এতে অর্ন্তভুক্ত

আছে৷ যাহোক, কোনো কিছুই বেদ থেকে দূরে হতে পারে না৷ বেদে শ্রমের মর্যাদা একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ধারনা৷ চলুন আমরা এই বিষয়ে বেদের কিছু মন্ত্র পর্যালোচনা করি৷

বেদে কৃষিকাজ করার মন্ত্র

ঋগবেদ ১/১১৭/২১ রাজা ও মন্ত্রীর উচিত সময়মত বীজ বপন ও কৃষিকাজ করা এবং আর্যের জন্য উদাহরণ স্থাপন করা এটাই তাদেরকে প্রশংসার যোগ্য করে তোলে৷

ঋগবেদ ৮/২২/৬ একই মনোভাবের পুনরাবৃত্তি৷

ঋগবেদ ৪/৫৭/৪ রাজার উচিত লাঙ্গল ধারন করা এবং মওসুম শুরুর আগেই কৃষিকাজ করা শুরু করা৷ তিনি দুধের জন্য স্বাস্থ্যবান গরু নিশ্চিত করবেন৷

সে অনুসারে, আমরা রামায়নেও উল্লেখ পাই, রাজা জনক যখন সীতাকে খুঁজে পেলেন তিনি তখন হলকর্ষন করছিলেন৷ (রামায়ন ১/৬৬/১৪)

ঋগবেদ ১০/১০৪/৪ এবং ঋগবেদ ১০/১০১/৩ পণ্ডিতগনের উচিত হাল চাষ করা৷

আদিপর্ব ৩/২৪ এ উল্লেখ আছে, ধৌম্য ঋষি তার ছাত্র আরুণিকে কৃষিজমিতে জলের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রন করতে পাঠাতেন, এটা ইঙ্গিত করে, ঋষি কৃষিকর্মে নিযুক্ত ছিলেন৷

ঋগবেদের পুরো ৪/৫৭ সুক্তটি কৃষিকাজের গৌরবের কথা বর্ণনা করে৷

বেদে পোশাক প্রস্তুতকারী ও বুননকারীর উপর মন্ত্র

ঋগবেদ ১০/২৬ বর্ণনা করে, ঋষি যজ্ঞ করে, তা সকলের জন্য উপকারী, যোগাযোগ বিজ্ঞানে দক্ষ হওয়া, ঊলের জন্য ভেড়া লালন পালন করা এবং ঊল থেকে কাপড় প্রস্তুত করা ও কাপড় পরিষ্কার করা৷

যজুর্বেদ ১৯/৮০ জ্ঞানী লোকেরা বিভিন্ন ধরনের কাপড় বুনন করে৷

ঋগবেদ ১০/৫৩/৬ বুনন শিল্পের উপরও গুরুত্ব দাও।

ঋগবেদ ৬/৯/২ এবং ঋগবেদ ৬/৯/৩ মন্ত্রে কাপড় বুননের প্রশিক্ষন কে-ন্দ্রের উপর জোড় দেয়া হয়েছে। যেটা সকলের শিক্ষা করা উচিত।

বেদে কারিগরী ও প্রযুক্তির মন্ত্র

কারিগর, প্রযুক্তিবিদ, কাঠমিস্ত্রী এবং দক্ষতা সম্পর্কিত শ্রমের ব্যাপারে বেদে 'তক্ষ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ঋগবেদ ৪/৩৬/১ঃ যারা রথ ও বিমান তৈরী করে তাদের গৌরবের উপর এই মন্ত্রে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পরের মন্ত্রটি বর্ণনা করে, এই কাঠমিস্ত্রী ও প্রযুক্তিবিদদের মহান যজ্ঞে আমন্ত্রন জানানো উচিত।

অধিকন্তু, একই সুক্তে, মন্ত্র ৬ তক্ষকে উচ্চ প্রশংসারযোগ্য বিবেচনা করে এবং পরের মন্ত্রটি, দক্ষ শ্রমিককে পণ্ডিত, সৃজনশীল ও ধৈর্য্যশীলরূপে আহবান করা হয়েছে।

অন্যান্য মন্ত্র যেগুলোতে দক্ষ শ্রমিকদের গৌরব বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো হলোঃ ঋগবেদ ১০/৩৯/১৪, ১০/৫৩/১০, ১০/৫৩/৮, অথর্ববেদ ১৪/১/৫৩, ঋগবেদ ১/২০/২, অথর্ববেদ ১৪/২/২২, ১৪/২/২৩, ১৪/২/২৪, ১৪/২/৬৭, ১৫/২/৬৫, ঋগবেদ ২/৪১/৫, ৭/৩/৭, ৭/১৫/১৪।

যে দক্ষতার কথা বলা হয়েছে অন্যান্যগুলোর মধ্যে সেগুলোতে অর্ন্তভুক্ত আছে যানবাহন তৈরী, কাপড়, বাসন কোসন, দূর্গ, অস্ত্র, পুতুল তৈরী, পাত্র, দেওয়াল, দালান ও শহর তৈরী।

ঋগবেদের কিছু মন্ত্রের মত ১/১১৬/৩-৫ ও ৭/৮৮/৩ এই মন্ত্রগুলো আর্য-দেরকে জলযান প্রস্তুত করতে উৎসাহিত করে ও দূরদূরান্তে ভ্রমন করে পৃথিবীকে আবিষ্কারের জন্য উৎসাহ দান করে। যারা নৌকা ও জাহাজ তৈরীতে নিযুক্ত আছে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে।

কিছু মন্ত্র বিভিন্ন ধরনের পেশাকে প্রশংসা করছে, যেমনঃ

- ব্যবসা — ঋগবেদ ৫/৪৫/৬, ঋগবেদ ১/১১২/১১

- মাঝি — ঋগবেদ ১০/৫৩/৮, যজুর্বেদ ২১/৩, যজুর্বেদ ২১/৭, অথর্ববেদ ৫/৪/৪, ৩/৬/৭
- নাপিত — অথর্ববেদ ৮/২/১৯
- স্বর্ণকার ও মালি - ঋগবেদ ৮/৪৭/১৫
- কর্মকার ও ধাতু গলানো — ঋগবেদ ৫/৯/৫
- ধাতুবিদ্যা - যজুর্বেদ ২৮/১৩

এই হলো প্রমাণ, বেদ শুধুমাত্র বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা ও প্রযুক্তির বর্ণনাই দেয় না, অধিকন্তু শ্রমের মর্যাদাও মহিমান্বিত করে।

সারসংক্ষেপ

এটা একটা ভিত্তিহীন অভিযোগ, যারা শ্রম নির্ভর কাজে লিপ্ত বেদ তাদেরকে হীন করে। বিপরীতে, বেদ শ্রমের সর্বোচ্চ মর্যাদা অনুমোদন করে।

লেখক সম্পর্কে

সঞ্জিব নেওয়ার বেদ, গীতা ও হিন্দুধর্মের উপর একজন যোগী পণ্ডিত। তিনি বেদ, যোগ, আধ্যাত্মিকতা ও হিন্দুধর্মের ভুল ধারণার উপর বেশ কিছু গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি অগ্নিবীরের একজন স্থপতি। অগ্নিবীর একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন, এটি ভারতে ও ভারতের বাইরে জাত পাত, লিঙ্গ, অঞ্চল ও ধর্মের সাম্যতার জন্য কাজ করে থাকে। তিনি হিন্দু একতা যজ্ঞের একজন অগ্রসেনানী, সকল অঞ্চল ও জাতবর্ন জুড়ে সমতা আনয়নের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছেন। তিনি একজন বাগ্মী কবি, সুবক্তা ও দক্ষ প্রেরনাদা-তা। তিনি আত্মহত্যা বা বিষাদগ্রস্থ প্রবণতা নিয়ে কাজ করেন। তিনি IIT-IIM এর প্রাক্তন ছাত্র এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বিশেষায়িত একজন বিশিষ্ট ডাটা সায়েন্টিস্ট। তিনি জাতপাত বা জন্ম ভিত্তিক বর্ণপ্রথাকে হিন্দু বিরোধী বিবেচনা করেন এবং এটিকে মেধাভিত্তিক বৈদিক প্রথা দ্বারা প্রতিস্থাপন করার জন্য তার একটি মিশন আছে।

অগ্নিবীর সম্পর্কে

শ্রী সঞ্জিব নেওয়ার অগ্নিবীর প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি একজন IIT-IIM প্রফেশনাল, ডাটা সাইয়েন্টিস্ট এবং যোগী, তিনি একজন ব্যাক্তির অভ্যন্তরের ও বাইরের জগৎকে উন্নত করতে একটি সমাধান সম্পর্কিত, আধ্যাত্মিকতায় চালিত, ও সৎ অভিগমন পথ প্রদান করেন। জীবনের সমসাময়িক চ্যালেঞ্জগুলোকে নির্দিষ্ট করতে, অগ্নিবীর বেদ, গীতা ও যোগের শ্বাশত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগে বিশেষায়িত। যারা আত্মহত্যা, বিষন্নতার সাথে সংগ্রাম করা, জীবন সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে যাওয়া, দিশাহীনতা, সামাজিক অসাম্যতাকে চিহ্নিত করতে অক্ষমতা এসবে (হতাশার) একদম প্রান্তসীমা থেকে ফিরে আসা, পরিবর্তন হয়ে যাওয়া এমন লোকেদের হাজার হাজার প্রশংসাই সত্যায়িত করে দেয়, এই সংগঠন ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

অগ্নিবীর বিভিন্ন উপেক্ষিত, অস্বস্তিকর কিন্তু জটিল ইস্যুগুলোকে জনগনের মনোযোগে আনার কৃতিত্ব দাবী করে। অগ্নিবীর ভারতে সামাজিক সাম্যতার প্রধান প্রবক্তা এবং 'দলিত যজ্ঞের' পথিকৃত। এই দলিত যজ্ঞ জাতপাত ও লিঙ্গ বৈষম্যের বাধা ভাঙ্গার একটি প্রথম পদক্ষেপ। অগ্নিবীর মুসলিম নারীদের অধিকার অভিযানের সামনের ভাগে থাকা দল, রক্ষনশীল ও গোঁড়া উপাদানগুলোর তীব্র প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হচ্ছে। যদিও, সে হালালা, যৌনদাসত্ব, বহু বিবাহ, তিন তালাক ও লাভ জিহাদের মত ন্যাক্কারজনক রীতিনীতিগুলোর বিস্তারিত লাইমলাইটে আনতে সফল হয়েছে এবং এগুলোর বিরুদ্ধে এক ঐক্যমত তৈরী করছে। অগ্নিবীরের নারী সহায়তা এই ধরনের কেইসগুলোকে দেখাশোনা করে ও অনেকের মুখে হাসি এনে দিয়েছে।

অগ্নিবীর একটি দক্ষ দল তৈরী করার জন্য দেশের সংবেদনশীল অংশজুড়ে অস্ত্রহীন দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর্মশালা প্রবর্তন করেছে, যাতে অপরাধীদের দিক থেকে আসা আক্রমন প্রতিহত করা যায়। মৌলবাদ মুক্ত করায় অগ্নিবীর প্রথম সারিতে এবং অসংখ্য যুবকদেরকে সে মূলস্রোতে যুক্ত করিয়েছে। রাজনৈতিক জবরদস্তি থেকে শিক্ষা দেওয়া প্রচলিত ইতিহাসের প্রামাণিকতার উপর প্রশ্ন তুলতে, ইতিহাসের উপর অগ্নিবীরের ব্যাখ্যা

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা সৃষ্টি করেছে।

অগ্নিবীর আত্মনির্ভরশীলতা, যোগ, হিন্দুধর্ম ও একঘেয়েমী জীবনের উপর লেখা বইয়ের পাশাপাশি সামাজিক সাম্যতা, জাত পাত সাম্য, লিঙ্গ সাম্যতা, মানবাধিকার, বিতর্কিত ধর্মীয় অধিকার ও ইতিহাস ইত্যাদির উপর বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। পাঠকগন এই বইগুলোর প্রশংসা করেছে এর সোজাসাপ্টা চিন্তাভাবনা, মৌলিকত্ব, সমাধান সম্পর্কিত, বাস্তবমুখীতা, সতেজ ও চিন্তার নমনীয়তার অভিজ্ঞতার জন্য।

প্রত্যেকে যারা একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করতে চান তাদেরকে স্বাগতম আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য বা অগ্নিবীর মিশনকে সাপোর্ট করার জন্য।

আমাদের সম্পর্কে জানতে, অনুগ্রহ করে ভিজিট করুনঃ

Website: www.agniveer.com.

Facebook: www.facebook.com/agniveeragni

Youtube: www.youtube.com/agniveer

Twitter: www.twitter.com/agniveer

আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে অগ্নিবীরের অংশ হতে, অনুগ্রহ করে আমাদের সদস্য ফরম পুরন করুনঃ www.agniveer.com/membership-form/

অগ্নিবীরকে দান করতে, অনুগ্রহ করে আমাদের পেমেন্ট পেইজের মাধ্যমে পরিশোধ করুনঃ www.agniveer.com/pay

Paypal: give@agniveer.com

অগ্নিবীর থেকে অন্যান্য বই কিনতে, ঘুরে আসুনঃ

www.agniveer.com/books

অগ্নিবীর
জাতির সেবা করছে। ধর্ম রক্ষা করছে